কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

এপ্রিল—৮২

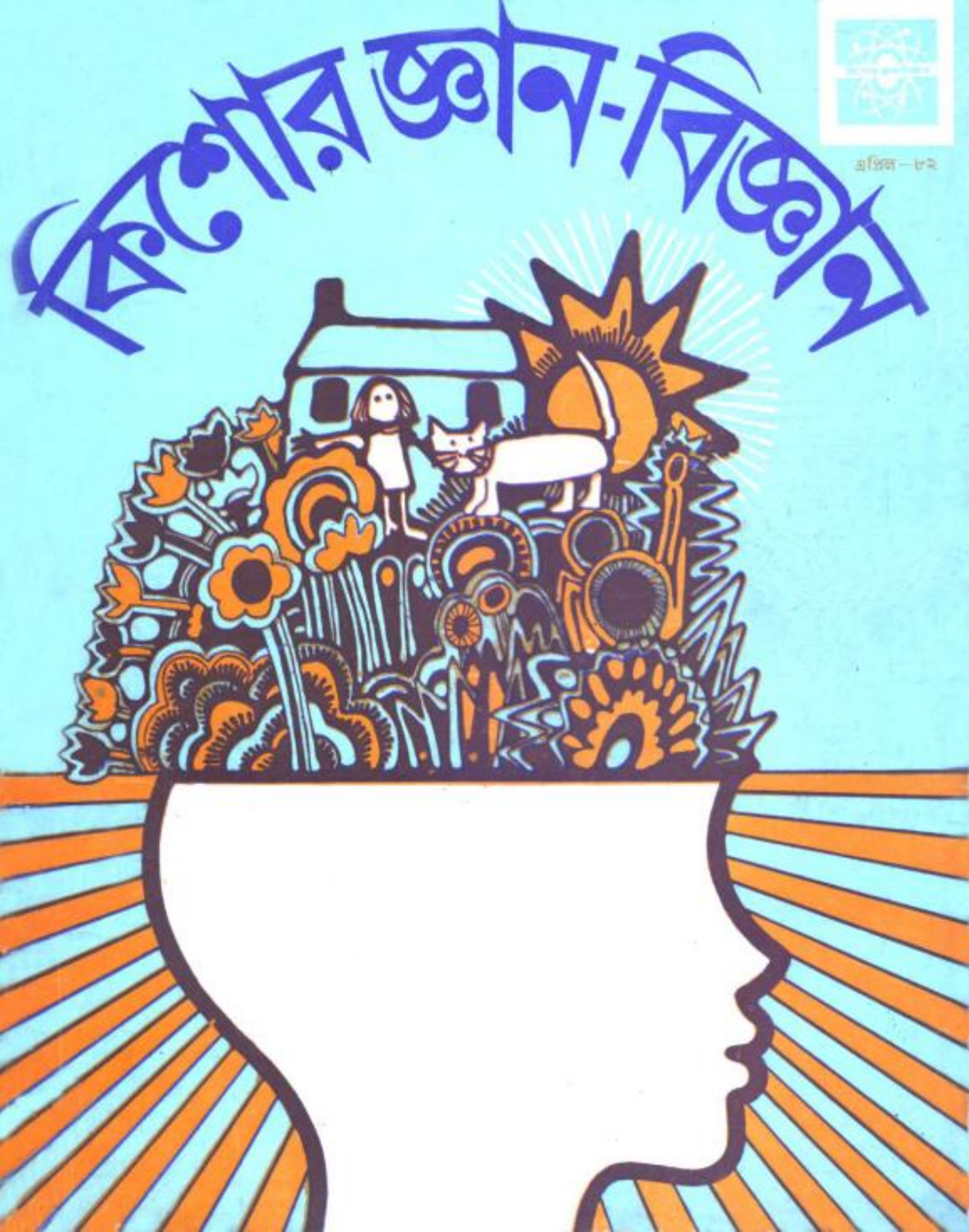

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by giving their rare magazines for scan.

Reach us at optifmcybertron@gmail.com

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

ক্যাপ্টেন ইঞ্জিনীয়ারকে ডেকে বললেন…

আরো আগুন জ্বালান, জাহাজের গতি এবার বাড়াতে হবে।

সুদক্ষ চালক জাহাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গেল মোজা প্লানীটির দিকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্লানীটিও সমান তালে চলতে শুরু করল।

এভাবে যদি চলতে থাকে, তবে আমরা কখনোই ওটার নাগাল পাবনা!

প্রায় একঘন্টা চেষ্টা চালানোর পর…

আচ্ছা নেড, এই অবস্থায় কি নৌকা নামান যাবে?

আজ্ঞে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে বাছাধনকে বশে আনা মুখের কথা নয়। আপনি জাহাজের গতি আরো বাড়ানর চেষ্টা করুন। দেখা যাক হারপুনের নাগালের মধ্যে পাই কি না।

এবার অগ্নিকুণ্ডে প্রচুর জ্বালানী কাঠ ফেলা হল। প্রফেসর অ্যারোনেক্সও হাত লাগালেন। গতিবেগ আরো বাড়ল।

ছোটাছুটি চলল আরো অনেকক্ষণ, কিন্তু ওটার নাগাল পাওয়া গেলনা।

নাঃ, এভাবে হবেনা। কামান দাগো!—

কামান দাগা হল। গোলাটা প্লানীটার কয়েক ফুট উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটু ঘুরিয়ে মারো। যে পারবে সে পাবে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ॥ এপ্রিল ॥ ১৯৮২
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বয়স একবছর পূর্ণ হল। এরই মধ্যে ছড়া, গল্প, রূপকথার রাজ্যে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান তার নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে। আমরা নতুন বিভাগ খোলার যা যা প্রতিশ্রুতি করেছিলাম—সবই শুরু হয়েছে। 'ছোটদের দপ্তর' ছাড়াও তোমাদের আরও লেখার সুযোগ রয়েছে—রচনা প্রতিযোগিতা বিভাগে। তোমাদের হাতে যখন এ পত্রিকা পৌঁছবে তখন প্রথম পর্য্যায়ের রচনা প্রতিযোগিতার লেখা পাঠাবার সময় শেষ হয়ে গেছে। তবে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রচনা পাঠাবার সুযোগ থাকবে। তোমরা নিশ্চয়ই লেখা পাঠাবে। তোমাদের জন্য আরও নতুন খবর হচ্ছে—নববর্ষ সংখ্যা থেকে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস ও দুটি নতুন ফীচার শুরু হবে—লিখবেন শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, বিমান বসু ও অরূপরতন ভট্টাচার্য। যা পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই খুশী হবে।

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদকীয় : ১
চিঠিপত্র : ২

দপ্তর থেকে
মহাকাশ থেকে বেতার সংকেত : সমরজিৎ কর ৩

উপন্যাস
শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও মঙ্গলগ্রহ : অদ্রীশ বর্ধন ১০

গল্প
পুতুল নিয়ে খেলা : সোমনাথ রায় ৩৭

পড়াশোনা
গ. সা. গু. নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি : নন্দলাল মাইতি ২০
রসায়নের সহজপাঠ : অমরনাথ রায় ২৬
আলোকের প্রতিফলন : ডঃ অলক চক্রবর্তী ৩৩

পশুপাখীর পরিচয়
বিরল প্রাণী - লামা : বিবেক রায় ৩১
বহুরূপী : তন্দ্রা ঘোষ ৪৩

ছবিতে গল্প
অজানা মহাকাশে : দেবদাস ৯
খুদে বৈজ্ঞানিক : দিলীপ দাস ১৩
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র : দিলীপ দাস ৩০
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা : ধীরেন বল ৫৬
জুলে ভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগ্স্ আণ্ডার দি সী : গৌতম কর্মকার প্রচ্ছদ : ২

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
আজব রূপান্তর : এ. সি. সরকার ১৫
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : বিবেক রায় ১৮
যমের খাস দূত : গঙ্গেশ বিশ্বাস ৪০
সূর্য কতোদিন বাঁচবে ? : অনীশ দেব ৫
যে ধাতু সোনার চেয়েও দামী ছিল : কমল নন্দী ১৪
ধূমকেতু : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৪
অঙ্কের মজার খেলা : জগদীশ চৌধুরী ৩২
বিচিত্র উদ্ভিদ : অংশুমান চক্রবর্তী ৪৮

খুদে বৈজ্ঞানিকদের আসর : কিন্নর রায়
জওহর শিশুভবনের বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী ৪৪
পূর্বভারত বিজ্ঞান শিবির '৮২ : ৪৬
ষষ্ঠ নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির একটি আলোর প্রতীক : ৪৬

ছোটদের দপ্তর
প্রশ্নোত্তর : ৪৯ ॥ নিজে বানাও প্রোজেক্টর : সৌমেন চক্রবর্তী ৫০ ॥ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা : শ্রীবৈজ্ঞানিক ৫০ ॥ সংখ্যাকূটের সমাধান : ৫০ ॥ রহস্যময় সিন্দুক : শান্তনু নায়েক ৫১ ॥ সংখ্যাকূট : সঞ্জয় রায় ৫৩ ॥ ভেবে কর : সুবীর দাস ৫৪

চিঠিপত্র

নভেম্বর '৮১ সংখ্যার সুনীল সরকার মহাশয়ের লেখা 'লাই ডিটেক্টর' পড়িয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। আমি জানিতে চাই আমাদের দেশের সাধারণ লোক ইহা কিনিতে পারিবে কিনা এবং ইহা কোথায় কিনিতে পাওয়া যাইবে। এই যন্ত্রটির দাম কত পড়িবে। —রাজা চক্রবর্তী

৪২, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিকাতা-৩১

ফেব্রুয়ারি (১৯৮২) সংখ্যায় প্রকাশিত 'মাটি থেকে আকাশে' প্রবন্ধের একটি অংশ আমি ঠিকমত বুঝতে পারছি না, অংশটি হইল—সাগরের উপর বাতাসের চাপ সাতশো ষাট মিলিমিটার। এখন আমার প্রশ্ন উক্ত চাপ কতখানি স্থানের উপর পড়িবে?

—অলককুমার মিত্র

ব্যানার্জীপাড়া রোড, বেহালা, কলিকাতা-৬০

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার ১৩ পাতায় সজল চক্রবর্তীর '৯-এর মজা' রচনাটিতে তিনি লিখেছেন ঐ এক অঙ্ক অর্থাৎ '৯'-এর সঙ্গে তাকে ৬ যোগ করতে বলো এবং তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করতে বলো এবং তুমি বলো ভাগ ফল ২। কিন্তু আমরা জানি ৯-এর সহিত ৬ যোগ করলে যোগ ফল হয় ১৫। ঐ ১৫ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় ২ এবং ভাগশেষ থাকে ১। কিন্তু তিনি তাঁর রচনাতে ঐ '১' উল্লেখ করেন নি।

—জয়জিৎ লাহিড়ী, রায়কতপাড়া—জলপাইগুড়ি

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায়ের "লেখচিত্র অংকনে সতর্ক হওয়া উচিত"—লেখাটির এক জায়গায় আছে "মূলবিন্দু O থেকে সংশ্লিষ্ট অক্ষ বরাবর X ও Y চলরাশিদ্বয়ের মান (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) মাপা হয়। X' O X (বাঁদিক থেকে ডানদিকে) এবং Y O Y' (উপর থেকে নিচে) অক্ষদ্বয়ের নামকরণের মাধ্যমে কোন্ দিকে ধনাত্মক ও কোন দিকে ঋণাত্মক রাশির জন্য তাহা নির্দিষ্ট হয়।"

উপরোক্ত কথাগুলোর প্রায় সমস্তগুলো মানা যায় কিন্তু "X' O X (বাঁদিক থেকে ডান দিকে)" কথাটি মানতে পারছি না। কারণ OX (ধনাত্মক) রেখাকে নির্দিষ্ট রেখে আমরা Anti-clockwise direction-এ এগিয়ে যাই এবং অক্ষগুলিকে যথাক্রমে X O X' ও Y O Y' এইভাবে নামকরণ করি। এ বিষয়ে লেখকের মত কি?

প্রদীপকুমার সরকার, ইটিণ্ডা ইউনিয়ন হাইস্কুল, ২৪-পরগনা

॥ গ্রাহক ও পাঠকগণের প্রতি ॥

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বয়স মাত্র এক বছর হলেও ইতিমধ্যেই এর জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা সর্বস্তরেই স্বীকৃত। বিজ্ঞান পত্রিকার আনুষঙ্গিক ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকার মূল্য প্রথম থেকেই কম রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পরবর্তী সংখ্যা (মে '৮২) থেকে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্য ২·০০ টাকার পরিবর্তে ২·৫০ টাকা নির্দ্ধারিত করা হল।

গ্রাহকদের পরবর্তী বছরের গ্রাহক চাঁদা (২৫ টাকা) দপ্তরে পাঠিয়ে গ্রাহক কার্ড রিনিউ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

—সার্কুলেশন ম্যানেজার

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশস্থান ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

২। প্রকাশকাল : মাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক, ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

৪। সম্পাদক রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক, ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

৫। মালিক : রবীন বল, ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

আমি রবীন বল এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

রবীন বল

প্রকাশক

মহাকাশ থেকে বেতার সংকেত

সমরজিৎ কর

বলতে পারো, ব্যাপারটা খুবই নাটকীয়। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮। প্রচণ্ড শীতে সারা ইংলণ্ড প্রায় জমাট। ওই সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী অদ্ভুত একটি খবর প্রকাশ করলেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের বেতার যন্ত্রে এক ধরনের বেতার সংকেত ধরা পড়ছে। বিচিত্র এই সংকেত। আমাদের বিশ্বাস, যে বস্তু থেকে এই বেতার সংকেত আসছে, আয়তনে তা খুবই ক্ষুদ্র। মনে হচ্ছে, তারা সৌরমণ্ডল থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এবং সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, আমরা যখন বেতার তরঙ্গের সাহায্যে কোন বার্তা পাঠাই, সেই বার্তা গ্রাহক যন্ত্রে যেমন বিপ্ বিপ্—বিপ্ বিপ্ বিপ্—বিপ্— বিপ্—এমন ধরনের শব্দ সৃষ্টি করে, দূরাগত সেই তরঙ্গই সৃষ্টি করছে তেমনই শব্দ। আর সেই শব্দের লক্ষ্য যেন আমরাই, এই পৃথিবীরই মানুষ। ইংরেজি pulse শব্দটির অর্থ হলো 'স্পন্দন'। এই শব্দটির কথা ভেবেই বিচিত্র সেই বেতার সংকেতের উৎসগুলির তাঁরা নাম রাখলেন 'পালসার্স'।

বিস্ময় আরও ছিল। তাঁরা দেখলেন, এক একটি উৎস থেকে বেতার সংকেত আসছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। যে কটি পালসার তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তাদের প্রথমটি থেকে সংকেত আসছিল ০.২৫ সেকেণ্ড অন্তর। অবশিষ্টদের ক্ষেত্রে ওই ব্যবধান ১.৩ সেকেণ্ড মধ্যে। এত স্বল্পকালীন ব্যবধানে মহাকাশ থেকে এক একটি বেতার সংকেত আসতে পারে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম ধরা পড়লো। অবাক কাণ্ড!

খবরটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো হাজারো জল্পনা। অনেকে সরাসরি বলেই ফেললেন, সাংঘাতিক ব্যাপার। এটা মোটেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপার নয়। কোন এলোপাথারি ঘটনাও নয়। ওই সংকেতগুলি নিশ্চয় কোন 'বেতার টেলিগ্রাফিক কোড'। সাংকেতিক বার্তা। সম্ভবতঃ দূর নক্ষত্র জগৎ থেকে আমাদেরই মত কোন সুসভ্য প্রাণী বেতার সংকেতের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। অতএব বিজ্ঞানীদের উচিৎ ওই সংকেতের পাঠোদ্ধার করা। বিচিত্র ওই বেতার সংকেত নিয়ে চটকদার গল্পও লিখে ফেললেন অনেকে।

কি করে অমন বিদঘুটে বেতার সংকেত ধরলেন, মশাই? জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করে বসলেন কেমব্রিজের একজন গবেষককে। নাম জোসেলাইন বেল। ব্যাপারটা তিনিই লক্ষ্য করেছিলেন প্রথম।

বেল সাংবাদিকটিকে বললেন, দেখুন দূর নক্ষত্র জগৎ থেকে আসছে কত রকম বিকিরণ। এই বিকিরণের মধ্যে রয়েছে দৃশ্যমান আলোক। অর্থাৎ যে আলোক আমাদের দেখার ক্ষমতা যোগায়। আর থাকে অদৃশ্য বিকিরণ। এদের মধ্যে পড়ে বেতার তরঙ্গ, একস্ রশ্মি, গামা, অতিবেগুনী, অবলোহিত এমন নানা রকম রশ্মি। আমি কয়েক বছর ধরে ওই বেতার তরঙ্গ নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিলাম।

কেন? সাংবাদিকটি প্রশ্ন করলেন।

কারণ একটি ঘটনায় আমি খুব অবাকই হয়েছিলাম। বললেন বেল।—আপনারা তো জানেন, আমাদের এই সূর্য প্রতি মুহূর্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে নানা রকম আলো। তার সঙ্গে রয়েছে নানারকম কণা। সব কণার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন প্রোটন এবং ইলেকট্রন। এ ছাড়া নানা রকম আয়নিত কণাও থাকে। প্রোটন এবং ইলেকট্রন কণা সূর্য থেকে বেরিয়ে প্রচণ্ড বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসের কণা বেগে অগ্রসর হলে যেমন ঝড় হয়। আমরা বলতে পারি, ওই কণারাও সৃষ্টি করে তেমন ঝড়। তা ওদের গতি তো কম নয়। সেকেণ্ডে শত শত মাইল। এই ঝড়কেই আমরা বলে থাকি সৌর-ঝড়। আমি ভাবছিলাম, ওই যে বেতার সংকেত বলছিলাম, যারা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে কোটি কোটি মাইল দূর থেকে, তারা তো ওই সৌর-ঝড়ের মধ্যে দিয়েই পৃথিবীর দিকে আসছে। সৌর-ঝড়ের কণাগুলির মধ্যে থাকে তড়িৎ আধান। তাই মনে হলো, ওই তড়িৎ-আধানের ঝড়ের মধ্যে দিয়ে আসার সময় বেতার-তরঙ্গগুলির রূপ কি পালটে যায় না? যদি পালটায়, তা হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে, সেটা জানার জন্যেই আমি পরীক্ষা চালালাম। আর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে ধরা পড়লো বিচিত্র ওই বেতার সংকেত।

আপনারা প্রথম যে পালসারটি আবিষ্কার করেন, তার নাম কী? সাংবাদিকটি প্রশ্ন করলেন।

CPO 950। বললেন বেল।—এর এক একটি

বেতার সংকেত আসে প্রতি ০.২৫ সেকেণ্ড অন্তর। এবং প্রতিটি স্পন্দন স্থায়ী হয় মাত্র কুড়ি মিলি সেকেণ্ড। জানেন নিশ্চয়, এক মিলিসেকেণ্ড হলো এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। এই পালসারটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে একশ' আলোক বৎসর। আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। অতএব একশ' বছরে আলোক যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকেই তো বলা হয় একশ' আলোক বৎসর? তা হলে ভাবুন কতদূর থেকে সেই বেতার সংকেত পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে।

এতদিন যে হৈ চৈ চলছিল, বেল এবং অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কথায় তাতে ভাটা পড়লো। তাঁরা জানিয়ে দিলেন, এই বিচিত্র বেতার সংকেত মানুষের মত কোন প্রাণী পাঠাচ্ছে না। প্রাকৃতিক কারণে বিশেষ ধরনের কোন কোন নক্ষত্র থেকেই আসছে এই সংকেত।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ালো, কোন কোন নক্ষত্র বলতে ঠিক কোন ধরনের নক্ষত্রের কথা বলছেন বিজ্ঞানীরা? এত দিন দুই শ্রেণীর নক্ষত্রের কথা বলতেন তাঁরা। আমাদের সূর্য পড়ে প্রথম শ্রেণীটির মধ্যে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্রদের বলা হয় 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' বা 'শ্বেত বামন।' এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল। বর্ণ নীলাভ-শুভ্র। এদের ঘনত্ব ১০০০ থেকে ১০০০০০০০ গ্রাম প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার। তাপমাত্রাও কম। সেই সঙ্গে আয়তনও।

কিন্তু এর পর বলা হলো আরও এক শ্রেণীর নক্ষত্রের কথা। যাদের কথা ১৯৩০ সালে প্রথম উল্লেখ করেন কয়েকজন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী—এল. ডি. ল্যানডাউ, ফ্রিটজ শুইকি, জে. রবার্ট, ওপেনহাইমার, প্রমুখ। তাঁরা বললেন, সাধারণ নক্ষত্র জ্বলছে। জ্বলতে জ্বলতে এক সময় তাদের জ্বালানি কম হয়ে আসে। তখন তাদের ভেতরকার মাধ্যাকর্ষণ বল প্রবল হয়। সেই বলের চাপে পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে পড়ে। হাইড্রোজেন ছাড়া সব রকম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন কণা। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রোটনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে নিউট্রন। ফলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে তখন শুধু থাকে নিউট্রন। অর্থাৎ পুরো নক্ষত্রটিই তখন হয়ে যায় নিউট্রনে গড়া। এ ধরনের নক্ষত্রকে বলা হয় 'নিউট্রন নক্ষত্র'।

মজার ব্যাপার এই, কোন নক্ষত্র যখন নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হয় তখন তার আয়তন অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায়। যেমন ধরো, আমাদের সূর্য যদি নিউট্রন নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়, তার ব্যাস দাঁড়াবে আঠারো মাইলের মতো।

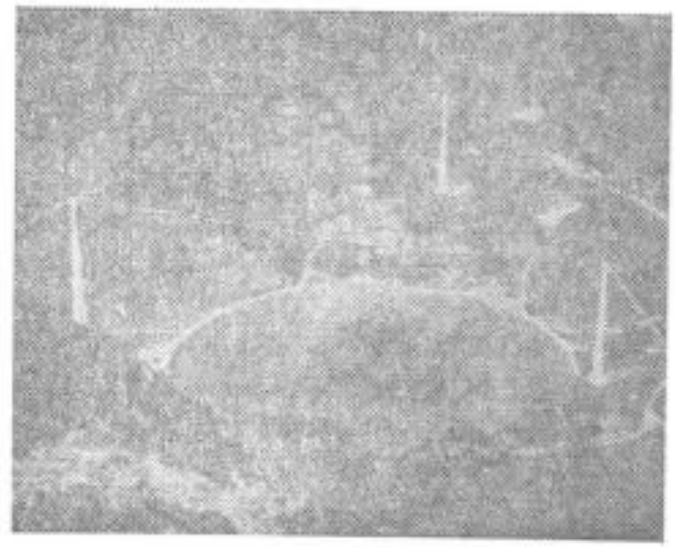

পুয়েরতোরিকোর আরেসিবোয় বসানো হয়েছে ৩০০ মিটার পরিধির এই বেতার অ্যানটেনা। এই অ্যানটেনাটির সাহায্যে পৃথিবীর মানুষ ভিন্ন নক্ষত্রের সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই নিউট্রন নক্ষত্র থেকেই আসছে সেই বেতার সংকেত। তাঁরা বলছেন, ব্যাপারটা কতকটা লাইট হাউসের মত। বন্দরে থাকে হাউস। উঁচু স্তম্ভ। তার মাথায় আলো—সার্চ লাইটের মত। সেই আলো অনবরত ঘুরছে। রাতে ঘোরার সময় সার্চ লাইটের সম্মুখে দাঁড়ালে আলোর সংকেত দেখা যায়। সার্চ লাইটের মুখটি বিপরীত দিকে গেলে অন্ধকার। ঠিক তেমনি, ওই নিউট্রন নক্ষত্রদের বুক কোন কোন জায়গা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে বেতার তরঙ্গ। নিউট্রন নক্ষত্র তার অক্ষের চারপাশে ঘুরছে, যেমন ঘোরে পৃথিবী। ঘোরার সময় বেতার সংকেত সৃষ্ট হচ্ছে যে দিকটায়, সেই দিকটি যখন পৃথিবীর দিকে ফেরে, তখন তার বেতার সংকেত ধরা পড়ে আমাদের যন্ত্রে। আবর্তনের সময় বেতার সংকেতকারী অংশটি যখন বিপরীত দিকে চলে যায়, সেই সংকেতও তখন আর আমরা পাই না। ওরা ঘুরছে প্রচণ্ড বেগে। নিজের অক্ষের চারপাশে একবার পাক খেতে ওরা সময় নেয় মাত্র কয়েক মিলি সেকেণ্ড। বলতে কি যদি সত্যিই তাই হয়, অবাক হওয়ার মতই কথা। এত বেগে ঘুরতে গেলে দরকার প্রচণ্ড শক্তি। অত শক্তি কি ভাবে ওরা পায়, সেটাই বিজ্ঞানীদের কাছে এখন বড় রকমের ধাঁধা।

যাই হোক। মানুষ কিন্তু থেমে নেই। কোন দিন যদি তা সম্ভব হয়, তোমাদের মনে হয় না কি, সেদিন বিজ্ঞান জগতে ঘটবে বড় রকম একটি বিপ্লব?

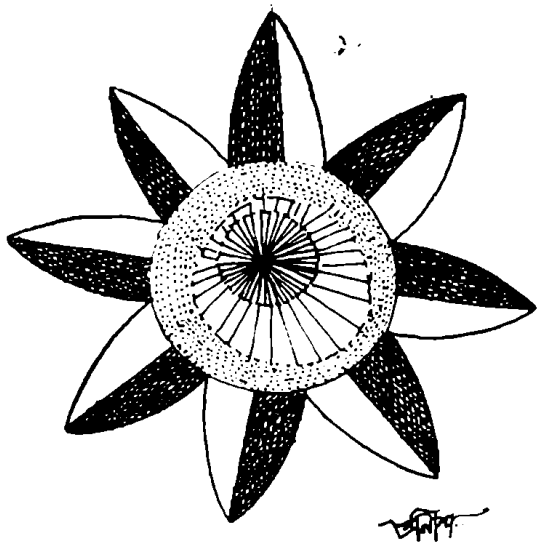

সূর্য কতোদিন বাঁচবে?

অনীশ দেব

এ প্রশ্ন আমাদের মনে জেগে ওঠাটা স্বাভাবিক, কারণ সূর্য আমাদের বিভিন্ন শক্তির প্রধান উৎস। তাছাড়া, সূর্য নিভে গেলে পৃথিবীবাসী এই মানুষ একই সঙ্গে তাল মিলিয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের বেঁচে থাকাটা আমাদের পক্ষে এতোই জরুরী যে ইচ্ছে না থাকলেও তার পরমায়ু নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে।

প্রথমেই জানিয়ে দিই, আকাশের ঐ জ্বলন্ত সূর্যটা কিন্তু মোটামুটি পাঁচশো কোটি বছরের পুরোনো। আর এই পাঁচশো কোটি বছর ধরেই বেচারা আমাদের শক্তি যুগিয়ে আসছে। পৃথিবীর সমস্ত শক্তিই একরকমভাবে তৈরি হয়েছে সূর্য থেকে—অবশ্য এটা জানতে হলে খুব খুঁটিয়ে ধাপে ধাপে বিচার করতে হবে। যেমন ধরো, কয়লা কিংবা কাঠ আমাদের প্রধান জ্বালানী। এবং এই জ্বালানীর আগুন থেকেই মানব-সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু সূর্য না থাকলে আমরা কয়লাও পেতাম না, কাঠও পেতাম না। কারণ কয়লা ও কাঠের উৎস গাছ। আর সূর্যের আলো ও তাপ ছাড়া কোন গাছ যে বড় হতে পারে না, বাঁচতে পারে না, সে তো তোমরা সবাই জানো। অতএব মূল উৎস সেই প্রভাকর সূর্য।

সূর্য কি দিয়ে তৈরি সেটা এবার জেনে নাও। এতে হয়তো তার আয়ু হিসেব করতে আমাদের সুবিধে হতে পারে। সূর্যে যা কিছু আছে তা হলো গ্যাস। শতকরা নব্বই ভাগ হাইড্রোজেন গ্যাস, আর বাকিটুকু প্রধানতঃ হিলিয়াম নামে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এই গ্যাসগুলো কি দাউ-দাউ করে জ্বলছে? মোটামুটি পনেরো কোটি কিলোমিটার দূর থেকে, অর্থাৎ, এই পৃথিবী থেকে সূর্যকে দেখে সেই ধারণাই জন্ম নেয় আমাদের মনে। কিন্তু জেনে রাখো, সূর্যের পক্ষে 'দাউ-দাউ' করে জ্বলা সম্ভব নয়। কারণ তার তাপমাত্রা। সূর্যের বাইরের তাপমাত্রা হলো ছ' হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস, আর ভেতরের তাপমাত্রা প্রায় দু' কোটি ডিগ্রী! এই সুবিশাল তাপমাত্রায় কোন মৌলিক কিংবা যৌগিক পদার্থের পক্ষে জ্বলা অসম্ভব। কেন, সেটাই এবার দেখা যাক।

কোন পদার্থের 'দহন' এর অর্থ সে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অন্য কোন যৌগে পরিণত হবে। এর জন্য তাপের প্রয়োজন হয়। ধরো, আমরা দেশলাইয়ের কাঠি ঘষে জ্বাললাম। 'দহন' হলো। অর্থাৎ, দেশলাইয়ের লোহিত ফসফরাস বিক্রিয়া করলো বায়ুর উপাদানের সঙ্গে। আবার দেশলাইয়ের আগুনে কাঠ পোড়ালেও কাঠের বিভিন্ন উপাদানের বিক্রিয়া হয় বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে। এসব বিক্রিয়াই কিন্তু ঘটে কম তাপমাত্রায়—একশো, দু'শো, তিনশো ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে। কিন্তু তাপমাত্রা যদি ক্রমে ক্রমে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বিক্রিয়ায় তৈরি যৌগিক পদার্থগুলো আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সমস্ত মৌলিক উপাদানে। যেমন, জলকে উত্তপ্ত করলে প্রথমে বাষ্প তৈরি হয়, তারপর আরও উত্তাপ দিতে থাকলে এক সময়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস আলাদা হয়ে যায়। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ক্ষেত্রেও অতি-উত্তাপ কার্বন এবং অক্সিজেন-এর জন্ম দেয়। সুতরাং

ছ' হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রায় সমস্ত পদার্থই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে নিজের মৌল উপাদানে, এবং এই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ দিয়ে আমাদের সূর্যটা তৈরি।

তবে এই প্রচণ্ড তাপের ফলে সূর্যে সব সময়েই ঘটে চলেছে নিউক্লীয় বিক্রিয়া (NUCLEAR REACTION)। এবং এই কারণে শতকরা দু'ভাগ যে কঠিন পদার্থ সূর্যে রয়েছে, তার সবটুকুই আছে গ্যাসীয় অবস্থায়। তার ওপর, সূর্যের ভেতরে অবিশ্বাস্য চাপের কথাটাও ভুললে চলবে না। সূর্যের অভ্যন্তরীণ চাপ হলো, আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় এক হাজার কোটি গুণ! সুতরাং এই প্রচণ্ড চাপ ও দু' কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিউক্লীয় বিক্রিয়ার ফলে প্রতি মুহূর্তে চারটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু মিলিত হয়ে তৈরি করছে একটি হিলিয়াম অণু। বিক্রিয়ার ফলে সামান্য একটু ভর (MASS) কমে গিয়ে তৈরি হয় সামান্য একটু শক্তি (ENERGY)। এবং এই শক্তিই সূর্যকে 'জ্বলন্ত' অবস্থায় থাকতে সাহায্য করে।

একটা কথা বলে রাখা ভালো যে সূর্যের উপাদান, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস, ঐ ভয়ঙ্কর ভৌত পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ আয়নিত অবস্থায় থাকে। ইলেকট্রনগুলো হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত। এবং প্রকৃতপক্ষে চার-চারটে হাইড্রোজেন কেন্দ্রক (NUCLEUS) মিলে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রক তৈরি করে। এই অবিরাম নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় কি হারে সূর্যের ভর কমে যায় জানো? প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ লক্ষ টন! অথচ আমাদের চোখে সূর্য বহু বছর ধরে সেই একই রকম আছে; কোন হেরফের তার হয়নি।

আমাদের চোখে এই তফাৎটুকু, ধরা পড়েনি তার কারণ প্রধানতঃ দুটো। এক, সূর্য আমাদের কাছ থেকে পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে। এবং দ্বিতীয় কারণ, সূর্যের ভর 2×10^{27} টন! প্রতি সেকেণ্ডে ক্ষয়ে যাওয়া চল্লিশ লক্ষ টনের চেয়ে যা অনেক বেশি: এছাড়া অন্যান্য কারণের একটা হলো, সূর্য জ্বলন্ত অবস্থায় থাকার ফলে, তার সঠিক চেহারা বা পরিধি আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না।

দেখা যাচ্ছে, সব দিক থেকেই সূর্য পৃথিবীর চেয়ে বড়। তার অভিকর্ষ পৃথিবীর আটাশ গুণ। তার আয়তন পৃথিবীর তেরো লক্ষ গুণ। এই রকম আরো কতো বিষয়ে সে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে একটা ব্যাপারে সে কিন্তু ভীষণভাবে হেরে গেছে আমাদের পৃথিবীর কাছে। সেটা কি জানো? গড় ঘনত্ব (MEAN DENSITY)।

পৃথিবীর গড় ঘনত্ব 5·5 গ্রাম/ঘন সে. মি। আর সূর্যের গড় ঘনত্ব 1.4 গ্রাম/ঘন সে. মি—অর্থাৎ প্রায় চার ভাগের এক ভাগ।

তবে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের ঘনত্ব তার অভ্যন্তরের সব জায়গায় সমান থাকে না। তেমনি সূর্যের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সূর্যের কেন্দ্রে ঘনত্ব হলো গড় ঘনত্বের প্রায় পঞ্চাশ গুণ! অর্থাৎ সেখানে বিভিন্ন গ্যাস খুব ঘন করে ঠাসা: পারদের ঘনত্বের প্রায় ছ' গুণ তাদের ঘনত্ব। অথচ সূর্যের বাইরের স্তরগুলো কিন্তু খুব পাতলা বা তনুভূত (RAREFIED)। সব চেয়ে বাইরে যে পরিমণ্ডলের স্তর রয়েছে, তার নাম বর্ণমণ্ডল (CHROMOSPHERE), এর গভীরতা, কয়েক হাজার মাইল, তাপমাত্রা মোটামুটি বিশ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। অথচ এর চাপ কতো জানো? আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের মাত্র হাজার ভাগের এক ভাগ! একমাত্র পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে এই অঞ্চলের কিছু অংশ দেখা যায়; তাকে বলা হয় কিরীটিকা (CORONA)। এই কিরীটিকা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বহু নূতন তথ্য পেয়েছেন। আর যে অংশের জন্য সূর্যকে এতো দীপ্তিমান মনে হয়, তার নাম দ্যুতিমণ্ডল (PHOTOSPHERE)। এই স্তর থেকেই আসল সূর্যের শুরু। এবং এই স্তরের তাপমাত্রার কথাই আমরা আগে বলেছি (6000°C)।

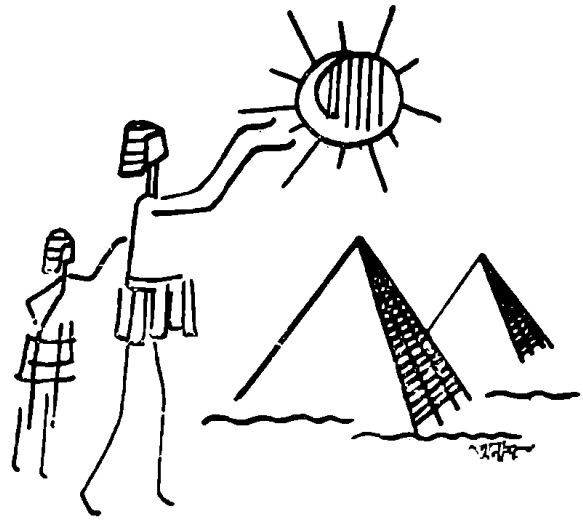

সূর্য সম্পর্কে এতো তথ্য মানুষ জানতে পেরেছে তার অনুসন্ধিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ও বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার

(RADIO-ASTRONOMY) অগ্রগতির ফলে। নইলে পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরের এই নক্ষত্রটি হয়তো চিরকাল আমাদের অজানা থেকে যেতো। সূর্য হয়ে থাকতো সূর্যদেবতা। সত্যি বলতে কি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরের ফারাও চতুর্থ আমেনোফিস সূর্যদেব বা 'আতন্'-এর পূজার প্রচলন করেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিলো, আমাদের পৃথিবীকে আলো দেয় একমাত্র সূর্য। এবং এই পূজোর ফতোয়া জারির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের নামটিও পালটে ফেলেন। নতুন নাম নেন, 'আখনতন্', যার অর্থ হলো 'স্বাগত আতেন্'।

শরীরের কোথাও কোন জ্বালা-যন্ত্রণা হলে কিংবা কোন স্বাদ – টক-ঝাল মিষ্টি—আমাদের মস্তিষ্কে এসে পৌঁছয় লক্ষ লক্ষ স্নায়ুতন্ত্রী বেয়ে। তারপর মস্তিষ্ক আমাদের জানিয়ে দেয় দেহের কোথায় কি ঘটেছে। অর্থাৎ, জিভের স্বাদ বা ত্বকের স্পর্শ আমরা টের পাই মস্তিষ্কের মারফৎ। এ ভাবে খবর পেতে আমাদের কিছুটা সময় লাগে। এই খবর স্নায়ুতন্ত্রী বেয়ে ছুটে চলে সেকেণ্ডে প্রায় একশো ফুট বেগে। তাই খুব তাড়াতাড়ি—বলতে গেলে, প্রায় তক্ষুনি—আমরা খবরটা পেয়ে যাই। কিন্তু সূর্য থেকে এভাবে খবর পেতে গেলে আমাদের লাগতো প্রায় একশো ষাট বছর!

এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '... মনে করা যাক এমন একটা দৈত্য আছে, পৃথিবী থেকে হাত বাড়ালে যার হাত সূর্যে পৌঁছতে পারে। দুঃসাহসী দৈত্যের হাত যতই শক্ত হোক, সূর্যের গা ছোঁবামাত্রই যাবে পুড়ে। কিন্তু পুড়ে যাওয়ার যে ক্ষতি ও যন্ত্রণা নাড়ীযোগে সেটা টের পেতে তার লাগবে প্রায় একশো ষাট বছর। তার আগেই সে মারা যায় তো জানবেই না।...'

এতো দূরে সূর্যটা রয়েছে যে সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় নেয় আট মিনিট।

আর একটা কথা ভাবলে হয়তো খুব অবাক লাগবে। এই সূর্যটা তার গ্রহমণ্ডলী নিয়ে এক ছায়াপথের চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে ভীষণ বেগে: সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল। আর সেই ছায়াপথকে এক পাক ঘুরে আসতে সূর্যের সময় লাগে বাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর। এবং সূর্য নিজের মেরুদণ্ডের ওপর এক পাক ঘুরতে সময় নেয় ছাব্বিশ দিন। যেটা পৃথিবীর তুলনায় ছাব্বিশ গুণ বেশি। আর সব শেষে একশো দশটা পৃথিবীকে পাশাপাশি রাখলে তোমরা সূর্যের ব্যাস এর (DIAMETER) আঁচ পেতে পারো।

সুতরাং নানা দিক থেকে বিশাল ও বিচিত্র এই জ্বলন্ত পিণ্ডটির সম্পর্কে বহু কথাই তোমরা শুনলে। আর পৃথিবীর মানুষের কাছে এই নক্ষত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা তো আগেই জানিয়েছি। সুতরাং সূর্যর ভালোমন্দ নিয়ে আমাদের তো একশোবার ভাবতে হবে! তার ওপর যখন জানতে পারছি প্রতি সেকেণ্ডে তার শরীর থেকে চল্লিশ লক্ষ টন ওজন কমে যাচ্ছে, তখন ভাবনা বেড়ে তৈরি হতে পারে দুশ্চিন্তা। সুতরাং, এবারে তার পরমায়ুর হিসেবটা করে ফেলা যাক।

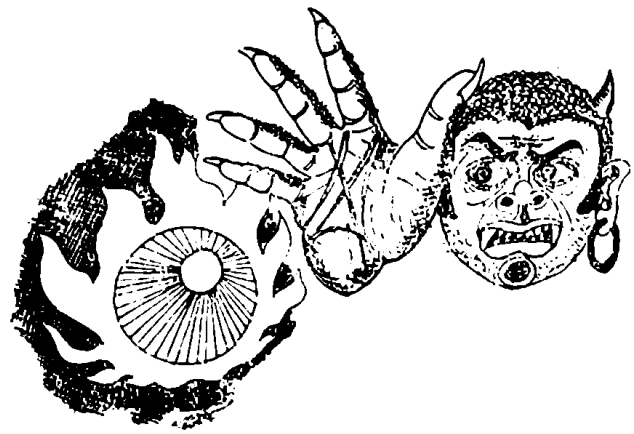

সূর্যের ভর 2×10^{27} টন। অতএব এই ভর পুরাপুরি ক্ষয়ে যেতে গেলে সময় লাগবে 5×10^{20} সেকেণ্ড, অথবা, প্রায় ষোলো লক্ষ কোটি বছর! কিন্তু একথা জানা গেছে যে সূর্যকে আমরা যেমনটি দেখি ঠিক সেইভাবে সে তার তেজ ও কিরণ নিয়ে টিঁকে থাকবে কম করেও ছ'শো কোটি বছর। অর্থাৎ, সে এখনও তার জীবনের অর্ধেকই পেরোয়নি।

পরিণতিতে সূর্যের অবস্থাটা কিরকম হবে সেটা বিজ্ঞানীরা কম বেশি আঁচ করেছেন। সাধারণতঃ কোন নক্ষত্র তার সাম্য বজায় রাখে দুটো বলের (FORCE) সমতায়। একটা তার অভ্যন্তরীণ বিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া চাপ, দ্বিতীয় বল (FORCE) তার নিজের মাধ্যাকর্ষণ বল। সূর্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যেদিন সূর্যের নিউক্লীয় বিক্রিয়া শেষ হবে, সেদিন সমস্ত হাইড্রোজেন পরিণত হবে হিলিয়ামে। নক্ষত্রের ভেতরের চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু থেকে অতি চাপে মুক্ত ইলেকট্রন কণাগুলো। আর মাধ্যাকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ভর সৃষ্টি করে গ্যাস পরমাণুর কেন্দ্রকগুলো (NUCLEUS)। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, হাইড্রোজেনের তুলনায় হিলিয়াম পরমাণুর

ইলেকট্রনের সংখ্যা দ্বিগুণ এবং কেন্দ্রকের ভর চারগুণ। ফলে সূর্যে প্রায় সবটাই হাইড্রোজেন পরমাণু থাকা অবস্থায় ইলেকট্রনগুলোর চাপ কেন্দ্রকগুলোর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ধরে রাখতে পেরেছিলো। তৈরি হয়েছিলো সাম্য-অবস্থা (EQUILIBRIUM)। কিন্তু সমস্ত পরমাণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হলে ইলেকট্রনের তুলনায় কেন্দ্রকের সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ। অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ চাপের তুলনায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেড়ে যাবে। সাম্য-অবস্থা টলে যাবে। এবং মাধ্যাকর্ষণের চাপে সূর্য তখন আয়তনে ছোট হতে শুরু করবে, তার ঘনত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকবে। এই অবস্থায় সূর্যের গড় ঘনত্ব হবে জলের ঘনত্বের তিরিশ লক্ষ গুণ! সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঘনত্ব হবে এর দশ গুণ। অর্থাৎ এক ঘন সেন্টিমিটার সূর্য বস্তুর ওজন হবে প্রায় তিরিশ টন। এই তথ্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন আমেরিকা নিবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী সুব্রমনিয়ান চন্দ্রশেখর।

মাধ্যাকর্ষণের এই চাপে সূর্যের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা যাবে শতগুণ বেড়ে। ফলে সে আয়তনে ছোট হয়ে গেলেও তার উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে বহুগুণ। এই অবস্থাকেই, বলা হবে সাদা-বামন (WHITE DWARF)। তখন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়তো সূর্যকে ভাববেন লক্ষ কোটি কোটি আলোক-বর্ষ দূরের কোন উজ্জ্বল নক্ষত্র! চাঁদ এখন আমাদের যা আলো দেয়, সূর্য তখন আলো দেবে তার মাত্র হাজার গুণ। আর চাঁদ তখন এতোই আবছা হয়ে যাবে যে সে বেচারীকে আর খালি চোখে দেখাই যাবে না। পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে নেমে যাবে শূন্য ডিগ্রির নিচে প্রায় দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস! পৃথিবীর বুকে সমস্ত প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া সূর্যের ওপর পড়বে বরফের আস্তরণ। সে আকাশে থাকবে এক নিষ্প্রাণ পিণ্ড হয়ে, তবে আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য আটটা গ্রহ তখনও মৃত সূর্যের সঙ্গী হয়ে থাকবে। অনুগত হয়ে প্রদক্ষিণ করে চলবে তাকে।

তবে এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সত্যিই কি মানুষ দেখতে পাবে নিভে আসা সূর্যকে? সম্ভবত না। কারণ হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে বিক্রিয়ার ফলে যে হিলিয়াম পরমাণু জন্ম নিচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও নেবে, তারা খুব ভালো তাপ পরিবহণ করতে পারে না। অর্থাৎ বিক্রিয়ার ফলে ও মাধ্যাকর্ষণের চাপে সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যে তাপ উৎপন্ন হবে সেটা খুব সহজে হিলিয়াম পরমাণুর স্তর ভেদ করে সূর্যের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এখন কিন্তু সে অসুবিধেটা নেই, কারণ হাইড্রোজেন তাপ পরিবহণে খুব তৎপর। সুতরাং কুপরিবাহী হিলিয়াম সূর্যের ভেতরের তাপকে বন্দী রেখে দেওয়ায় এমন একটা পরিস্থিতি আসতে পারে যখন সূর্যের অভ্যন্তরীণ তাপ ও চাপে এক বিশাল বিস্ফোরণ ঘটবে। সূর্যের তেজও যাবে বহু বেড়ে। এখন সূর্যের যা তেজ, তার চেয়ে মাত্র একশো গুণ বেশি হলেই, আমাদের নদ-নদী সমুদ্রের জল টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে। সুতরাং লক্ষ লক্ষ গুণ তেজ বেড়ে গেলে আমাদের পৃথিবী মুহূর্তে ভস্ম হয়ে মিলিয়ে যাবে মহাশূন্যে। সেই মহা বিস্ফোরণের পর সূর্যের সঙ্কোচন শুরু হবে। কিন্তু তা দেখবার জন্য পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকবে না।

এতো সব ব্যাপার দেখেশুনে তোমরা কেউ ভয় পেয়ো না কিন্তু। কারণ সূর্যকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'হে সূর্যদেব, আর কতদিন আমরা তোমার জ্যোতির আশীর্বাদ লাভ করবো?' তাহলে দেবতা নিশ্চয়ই স্মিত হেসে উত্তর দেবেন, 'আপাতত ছ'শো কোটি বছর কোন ভয় নেই, বৎস।' সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তবে একটা কথা, এর পর থেকে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যটাকে যখন দেখবে তখন ঐ জ্বলন্ত বস্তুটার গুরুত্ব একটু নতুন করে চিন্তা কোরো।

প্রকৃতি বিজ্ঞানী

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নতুন বই

পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ ৮·০০

প্রকাশিত হয়েছে

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ম্যাট রওয়ানা হোল।
ওর ওপর শক্তি-রশ্মি প্রয়োগ করতে হবে।
দূরত্ব তাড়াতাড়ি কমে আসছে... প্রোটন জেনারেটর চালু করো...!
শক্তি রশ্মি চালু করো... এবার!
অদৃশ্য শক্তি তাকে টেনে নিয়ে চললো ছোট একটা গ্রহের দিকে
মহাকাশযান থামামাত্রই ব্রেক লাগিয়ে বেরিয়ে এল
ওকে ধরো!
এখুনি বের করছি ওকে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

শার্লক হোমস এবং চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আগে যা ঘটেছে

অদ্ভুত দর্শন একটা কৃস্ট্যালের ভেতর মঙ্গল গ্রহের আশ্চর্য সব দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন শার্লক হোমস্ ও এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। সেই থেকেই সব ঘটনার শুরু। কৃস্ট্যালের ভেতর দিয়ে সেইসব আশ্চর্য প্রাণীরা উড়ে এসে পৃথিবীতে এসে পড়ল। বিরাট চোঙার মতো চেহারা—তিন পায়ে হাঁটছে।

বৈদেশিক দপ্তর ও সরকারী তরফের অনুরোধ—দেশের এই ভয়াবহ বিপদের সময় হোমস্‌কেই দায়িত্ব নিতে হবে মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে মোকাবিলার।

মিসেস হাডসনকে গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন শার্লক হোমস্। লণ্ডন শহর এখন জনশূন্য। শুধু শোঁ-শোঁ সাইরেনের আওয়াজ—আর মঙ্গলের দানব তাণ্ডবলীলা। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল লণ্ডনের পথে আতঙ্কিত ইন্‌সপেক্টর হপকিন্সের সঙ্গে। হোমসের হাতে সময় নেই। কারণ জরুরী তথ্য পাওয়া গেছে মঙ্গলগ্রহীদের আচরণে। লাল ফুলগুলো মরে বাদামী হয়ে যাচ্ছে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল হোমসের। তবে কি সত্যিই পৃথিবীকে বাঁচানো সম্ভব?

ওয়াটসনের কথা ভেবে হোমস্ চিন্তিত। এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জারই বা কোথায় নিখোঁজ হলেন? পৃথিবীকে কি তিনি মঙ্গলগ্রহীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন?

গোটা লণ্ডন শহর যেন জাহাজে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোনমতে জেসিকে জাহাজে তুলে দিয়ে চ্যালেঞ্জার রয়ে গেলেন। আর সেই সময়েই শুরু হল মঙ্গলগ্রহীদের নীল বিদ্যুৎ বর্ষণ। খুব দ্রুত নিজের বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হলো প্রফেসর। আর সেই সময়েই চাঁদের আলোতে কার যেন ছায়া সামনে পড়ল। চোখের পলকে এগিয়ে এল জিঘাংসায় উন্মত্ত ধাতুর শুঁড়। প্রফেসর চট্ করে ঘরে ঢুকলেন। ঘরের মধ্যে থেকে এ দৃশ্য ভালদেখা যায় না। এক একবার শুঁড় বুলিয়ে খাঁচায় পুরছে মানুষ। চিন্তান্বিত প্রফেসর বেকার স্ট্রীটেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ওয়াটসনের অভিজ্ঞতা

ওয়াটসন ছিল লণ্ডন শহরেই—হাইগেট অঞ্চলে। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে ওর যে বিশ্বস্ত আর্দালি মুরে ওর জীবন বাঁচায়। তার অন্তিম শয্যায় হাজির ছিল প্রথম সিলিণ্ডার সারে জেলায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে থেকেই। মুরে তখন অচেতন। দিনরাত সেবা করে গিয়েছে ওয়াটসন। শুক্রবার প্রথম চোঙা নামল ওকিংয়ে। তার পরের সাতটা দিনে অনেক কাণ্ডই ঘটে গেল সারে জেলা আর লণ্ডন শহরে। প্রতিরাতে নামল একটা চোঙা। প্রতিদিন আসতে লাগল নতুন নতুন খবর। প্রতিটিই আগের চাইতে উৎকণ্ঠাময়, ভয়ংকর এবং রোমাঞ্চকর। তারপর শুরু হল লণ্ডনত্যাগের হিড়িক। হাইগেট পর্যন্ত ফাঁকা হয়ে গেল সাতদিনের মধ্যে। অথচ একদিনের জন্যেও মাত্র পাঁচ মাইল দূরে বেকার স্ট্রীটে গিয়ে বন্ধুবর শার্লক হোমসের খবরটা পর্যন্ত নেওয়ার সময় হল না ওয়াটসনের।

হল মুরের মৃত্যুর পর চাদর দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে গিয়ে উঁকি মারল বাইরে। এই ক'দিন রাস্তায় এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগে চলমান ধাতব দানবদের সে ছুটতে দেখেছে। ধাতুর জয়েন্ট থেকে ফস ফুস করে সবুজ বাষ্প বেরিয়ে আসতে দেখেছে ছোটার সময়ে। ছাদের মাথা দিয়ে একশ' ফুট লম্বা বয়লারের মাথাও দেখেছে। দেখেছে এপাশে ওপাশে বহু বাড়ী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে মেটাল মনস্টারদের আক্রমণে। দেখেছে নীল বিদ্যুতের ছোঁয়ায় বড়ীর পর বাড়ী কিভাবে নিমেষে জ্বলে উঠছে। দেখেছে রাস্তা থেকে পলায়মান মানুষগুলোকে কিভাবে শুঁড় বুলিয়ে টপাটপ তুলে নিয়ে পিঠের খাঁচায় বন্দী করে রাখছে আকাশছোঁয়া দৈত্যরা। ভাগ্যক্রমে অক্ষত থেকে গিয়েছে ও যেখানে ছিল, সেই বাড়ীটি। তাই ওপর তলার জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে কিভাবে ফাইটিং মেশিনরা কালো ধোঁয়া ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ মেরেছে, সৈন্য মেরেছে, মারমুখো জনতাকে মেরেছে। তারপর দেখেছে সেই ধোঁয়াই থিতিয়ে গিয়ে কালো গুঁড়ো হয়ে রাস্তা ছেয়ে গিয়েছে—তার ওপর রাস্তার কুকুরকে হাঁটতে দেখেছে—কুকুর কিন্তু মরেনি। এ থেকেই বুঝেছে, কালো ধোঁয়া শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়লে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

মুরে যখন মারা গেল অজ্ঞান অবস্থাতেই, তখন লণ্ডন নিস্তব্ধ। পথঘাট খাঁ-খাঁ করছে। ওষুধের ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল ওয়াটসন। হেঁটেছে রাতের অন্ধকারে—

ঘুমিয়েছে পরিত্যক্ত বাড়ীর মধ্যে দিনের বেলা। পাঁচ মাইল পথ পেরুতেই প্রাণান্ত হয়েছে। প্রিমরোজহিলের ওপর আধডজন ফাইটিং মেশিনকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝেছে ঐখানেই তাদের আসল খাঁটি। ঐ জন্যে অমন সবুজ আলোয় আলোকিত হয়ে থাকে জায়গাটা। নালায় দেখেছে অদ্ভুত লাল ফুল। মাটিতে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেই ফুল। রেল লাইনের বাঁধ পর্যন্ত ছেয়ে গেছে বিচিত্র ফুলে। রিজেন্ট স্ট্রীটে দেখেছে ঝকঝকে সাদা আলো। ছুটে গিয়েছিল ওয়াটসন নিজেও। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। দূর থেকেই দেখেছে টপাটপ মানুষ তুলে খাঁচায় পোরার দৃশ্য। ফাইটিং মেশিনদের ধারে কাছেও আর ঘেঁসেনি ওয়াটসন—আলো দেখে আর ভোলেনি। পরের দিন ধুঁকতে ধুঁকতে বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে বন্ধুবরের কামরায় ঢুকে দেখেছে শার্লক হোমস্ প্রশান্ত চিত্তে চেরিকাঠের পাইপ ঠাসছে পারস্যদেশের চটিজুতোয় রাখা তামাক দিয়ে।

ওয়াটসনকে দেখেই বলেছে সহজভাবে—"এসো ওয়াটসন। তোমাকেই খুঁজছিলাম।" যেন হাতে একটা জটিল কেস এসেছে—আলোচনা দরকার।

আর সইতে পারেনি ওয়াটসন। মাথা ঘুরে পড়ে গেছে একটা চেয়ারে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ব্র্যাণ্ডি এনে বন্ধুর গলায় ঢেলে দিয়েছে হোমস্। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ওয়াটসন জিজ্ঞেস করেছে—"অ্যাদ্দিন এখানেই ছিলে নাকি?"

"মোটেই না। রোববার বেরিয়েছিলাম মিসেস হাডসনকে নিয়ে। গাঁয়ে রেখে এলাম—নিজের লোকজন আছে সেখানে। ফিরেছি বুধবার। অপেক্ষায় ছিলাম তোমার আর প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের।"

"প্রফেসর চ্যালেঞ্জার!"

"হ্যাঁ। বিরাট বৈজ্ঞানিক। নিজেকে আরও বিরাট মনে করেন।"

"হামবড়া?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁর অপেক্ষায় কেন?"

"কৃস্ট্যালটা তাঁর কাছেই গচ্ছিত রেখেছি যে।"

"কোন্ কৃস্ট্যালটা?"

হোমস্ তখন খুলে বলল। এতদিন যা বলেনি ওয়াটসনকে একবাড়ীতে থেকেও—সব বলল। বলল, কিভাবে চ্যালেঞ্জার আর তিনি আগে থেকেই জানতেন মঙ্গলগ্রহ থেকে আক্রমণ শুরু হবে পৃথিবীতে। ওকিংয়ে প্রথম চোঙাটা পড়তেই চ্যালেঞ্জার দৌড়ে গেছিলেন সেখানে। কিন্তু তার কথা না শুনে স্টেন্ট আর ওগিলভি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা মরেছে। হয়ত চ্যালেঞ্জারও। কেননা সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি নিপাত্তা।

ঠিক এই সময়ে সদর দরজা থেকে বাড়ী কাঁপানো ষণ্ডকণ্ঠে একটা হাঁক ভেসে এল—"মহাশয়ের অন্দরে কি প্রবেশ করতে পারি?"

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে চেনে মঙ্গলগ্রহীরা

ধনুক থেকে যেভাবে শন্ শন্ করে তীর ছুটে যায়, সেইভাবেই শার্লক হোমস্ চক্ষের নিমেষে ছিটকে গেল চেয়ার থেকে। দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে হৈহৈ করে যাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল ওপরের ঘরে, তাঁকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ওয়াটসন। এযে মানুষ-গরিলা! যেমন চওড়া কাঁধ, তেমনি লোমশ ভুরু। বুকের পাটা তো প্রকৃতই দরজার কপাটের মত। ইয়া দাড়ি—অ্যাসীরিও নৃপতিদের মত। ঘন নীল চোখ।

'ওয়াটসন'? সেই ডাক্তার? তোমার সহযোগী?

হাতে ঝুলছে একটা টিনের বাক্স। এ আবার কে?

নীরব জিজ্ঞাসার জবাব দিল হোমস্—"প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, যার কথা তোমাকে বলছিলাম, ওয়াটসন।"

"ওয়াটসন?" বিরাট ভুরু কুঁচকে প্রফেসর বললেন—

"এই সেই ওয়াটসন ? ডাক্তার ? তোমার সহযোগী ?"

"হ্যাঁ। এইমাত্র আপনার কথাই বলছিলাম। ভাবছিলাম হয়ত আর ইহলোকে নেই আপনি।"

"হোম্‌স্, মাইডিয়ার হোম্‌স্।" অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার। "প্রায় সেই অবস্থাই হতে বসেছিল আজ সকালে—তাই পালিয়ে এলাম।"

স্থির চোখে চেয়ে হোম্‌স্ বললে—"খুলে বলুন।"

"আমরা তিনজনেই এখানে বুদ্ধিমান—কম বেশী।" বলে একটু থামলেন। কারও আপত্তি নেই দেখে ফের বললেন—"কিন্তু আমাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বলে মঙ্গলগ্রহীরা আমাকেই চিনে রেখেছে—কারণ, আমিই এতদিন ধরে তাদের দেখেছি কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে। তারাও দেখেছে আমাকে।"

"ঠিক কথা," হোম্‌স্ সায় দিতে আত্মগর্বে আরো স্ফীত হলেন প্রফেসর।

বললেন—"তাই ঠিক করলাম আজ ভোর রাতে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করা যাক। লুকোচুরি খেলায় ওদের একজনকে আমার বাড়ীতেই সেদিন হারিয়ে দিয়েছি। কাল রাতে রিজেণ্ট স্ট্রীটে আলো জ্বালিয়ে মানুষ তোলার দৃশ্যও দেখেছি—"

"আমিও দেখেছি," ফ্যাকাশে মুখে বলল ওয়াটসন—"কিন্তু কেন প্রফেসর ?"

অনুকম্পার চোখে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন—"খাবার জন্যে। আমাদের শিরায় আর ধমনীতে নল ঢুকিয়ে রক্ত টেনে নিয়ে ওরা নিজেদের শরীর চাঙা রাখে—কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে সে দৃশ্যও আমি দেখেছি।—ওকী! হোম্‌স্, তোমার বন্ধু অজ্ঞান হয়ে যাবে মনে হচ্ছে!—হবে না ? তাহলে দয়া করে ডাক্তার, আমার কথার মাঝে অমন করে আঁৎকে উঠো না। আজ সকালে ঠিক করলাম ওদের চেনা দিয়ে দেখি কি করে।"

"তারপর ?" গম্ভীর হয়ে গেল হোম্‌স্।

"মাথায় কালো কাপড় চাপা দিয়ে চেয়ে রইলাম কৃস্ট্যালের দিকে। যন্ত্রটা ওদের। লণ্ডনেই কোথাও আছে, সে খবরও রাখে। তাই কিছুক্ষণ ওদের নররক্ত পানের দৃশ্য দেখবার পর হঠাৎ একজন সটান চাইল আমার চোখের দিকে।"

ওয়াটসন নিশ্চুপ। হোম্‌স্ পাইপ ধরিয়ে নিল দেশলাই জ্বালিয়ে।

প্রফেসর বললেন—"ব্যাটাচ্ছেলে অনেকক্ষণ ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর কৃস্ট্যাল অন্ধকার হয়ে গেল। আমিও গতিক সুবিধের নয় বুঝে এই টিনের বাক্সে কৃস্ট্যালটাকে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে। আধ মিনিটও গেল না—দুটো মোড় পেরোতে না পেরোতেই এনমোর পার্কের বাড়ীর সামনে হাজির হল একটা তেপায়া যন্ত্র। দূর থেকেই শুনলাম ভাঙচোরের শব্দ। তছনছ করে কৃস্ট্যাল খুঁজছে। না পেয়ে এতক্ষণে বোধহয় বাড়ীটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়েও দিয়েছে। আমি আর ওমুখো হচ্ছি না।"

কাষ্ঠ হেসে হোম্‌স্ বললে—"ওদের চোখে আপনি তাহলে আসামী।"

"আসামী না কচু!" হুংকার ছেড়ে বললেন চ্যালেঞ্জার। "ওদের কৃস্ট্যালটা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাকে। কিন্তু কৃস্ট্যাল তো এইখানে—"

বলে, টিনের বাক্সটা তুলে টেবিলের ওপর রাখলেন প্রফেসর।

ভিন্‌গ্রহীরা কি মঙ্গলের জীব ?

আঁৎকে উঠল ওয়াটসন—"অ-আপনি কৃস্ট্যালকে মাঠে ময়দানে ফেলে এলে পারতেন।"

"কেন ডাক্তার ?" দুই ভুরু নাচিয়ে বললেন প্রফেসর।

"কৃস্ট্যালের পেছন পেছন এখানেও তো আসতে পারে।"

"আসতে পারে কি ডাক্তার, আসবেই।"

ওয়াটসন প্রায় লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে।

সাদা দাঁত বার করে হাসলেন প্রফেসর।

বললেন—"মাভৈঃ। এই বাক্সের বাইরেটা টিনের—ভেতরে সিসের পাত আছে। না থাকলে আমার পেছন পেছন ওরা এখানে এসে যেত এতক্ষণে।"

"সিসের পাত!"

"হ্যাঁ। যাতে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বা বিকিরণ যোগাযোগে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলেই হানাদার ব্যাটাচ্ছেলে দিশেহারা হয়ে গেছে, আমার টিকি ধরতে পারেনি।"

"অ!" আশ্বস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করল ওয়াটসন।

চ্যালেঞ্জার ফের বললেন—"কিন্তু ওদের সঙ্গে একটা মোকাবিলা দরকার। মেশিনের সঙ্গে নয়—জ্যান্ত হানাদারের সঙ্গে। কৃস্ট্যাল এনেছি সেই কারণেই।—হোম্‌স্, বুঝেছো, কি বলতে চাই ?"

"বিলক্ষণ," মুচকি হাসল হোম্‌স্। "এক ব্যাটাকে জ্যান্ত ধরতে চান। এই তো ?"

"রাইট।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা মঙ্গলগ্রহ থেকে এলেও মঙ্গলের জীব নয়।"

"সে বিশ্বাস আমারও আছে। এতদিন প্রকাশ করিনি," সায় দিল হোম্‌স্।

"আমি জানতাম, তোমার বুদ্ধিমত্তা আমার চাইতে খুব একটা নিরেস না হলেও এ ধাঁধার জবাব বার করবেই। সন্দেহটা হল সেইদিন যেদিন দেখলাম ওরা মঙ্গলের পাতলা বাতাসে ভারী দেহ নিয়ে আস্তে আস্তে চলাফেরা করছে। মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ করা ওখানকার জীবদের দেহের ওজনও সেই অনুপাতে কম হওয়া উচিত। কিন্তু তা তো নয়। মেশিনগুলো দেখেও মনে হল নকল অক্সিজেনের কারখানা। আসলে ওরা অন্য গ্রহের জীব। মঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছিল ওখান থেকে পৃথিবী লক্ষ্য করে মহাকাশযান ছুঁড়তে সুবিধে হবে বলে। কেননা, মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ কম।"

"এগজ্যাক্টলি" সায় দিল হোম্‌স্।

"মঙ্গল থেকেই ক্রুস্ট্যালটাকে ওরা বহুদিন আগে যে ভাবেই হোক পৃথিবীতে পাঠায় তার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর হালচাল পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। করেওছে। সেইসঙ্গে করেছি আমরা—ওদের হালচাল।" বলে বুক ফুলিয়ে কালো চাপ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—"আমি, এই সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, ওদের গ্রহের আকাশ দেখেছি, গ্রহের চেহারা দেখেছি, দেখে গ্রহবাসীদের চেহারা কি রকমটা হওয়া উচিত, তা আঁচ করে নিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ওরা এসেছে সৌর জগতের বাইরের এমন কোনো গ্রহ থেকে যেখানে এবং যেখানকার ধারে কাছের গ্রহে মানুষের মত দুপেয়ে জীব নেই—আছে তেপায়া জীব। তাই ওরা তেপায়া মেশিনের কল্পনা করতে পেরেছে—চাকাওলা গাড়ীর কথা ভাবতেও পারেনি—যা এই পৃথিবীর সভ্যতাকে একলাফে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেকখানি।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান," বাধা দিয়ে বললে ডাক্তার ওয়াটসন—"একেবারেই সৌরজগতের বাইরে চলে যাচ্ছেন কি হিসেবে?"

"কারণটা খুলেই বলা হয়েছে, বৎস ডাক্তার। মঙ্গলের আকাশে ডবল চাঁদ দেখেছি, বৃহস্পতি আর শনিগ্রহেও একাধিক চাঁদ আছে। কিন্তু সেসব গ্রহের আকাশ মেঘে ঢাকা—পৃথিবী পর্যবেক্ষণের অসুবিধে। কিন্তু মঙ্গল থেকে পৃথিবীকে দেখতে অনেক সুবিধে। ওদের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত—বহু বছর আগে থেকেই যদি দেখত, তাহলে দু'পেয়ে অথবা চাকাওলা মেশিন উদ্ভাবন করত। কিন্তু তা করেনি। অন্যগ্রহে তিনপেয়ে মেশিন বানিয়ে অভ্যস্ত বলেই মঙ্গলের বুকে ঘাঁটি গেড়ে তিনপেয়ে মেশিনই বানিয়েছে।"

ধমক খেয়ে মিনমিন করে ওয়াটসন বললে—"কিন্তু পৃথিবী গ্রহেও ক্যাঙারু নিজেদের ল্যাজ ব্যবহার করে তৃতীয় পায়ের মত।"

"কিন্তু তারা উন্নত জীব নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক সরীসৃপও ইয়া মোটা ল্যাজ ব্যবহার করত ঠেকনা হিসেবে ভারী শরীরটাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে। কিন্তু তেপায়া জীব এ পৃথিবীতে কোথাও নেই—বিবর্তন সেভাবে ঘটেনি। ঘটেছে অনেক দূরে সৌরজগতের বাইরে কোথাও। অক্টোপাসের মত এই জীবেরা গ্রহে গ্রহে বিজয়কেতন উড়িয়ে পৃথিবী গ্রহ বিজয়ের স্বপ্নও দেখেছিল মঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে। বন্ধুগণ, ওদের সেই অভিযান ভণ্ডুল করবার জন্যেই জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার এই ক্রুস্ট্যাল নিয়ে পালিয়ে এসেছে এইখানে।" ক্রমশঃ

ছবির মজা ● দিলীপ দাস

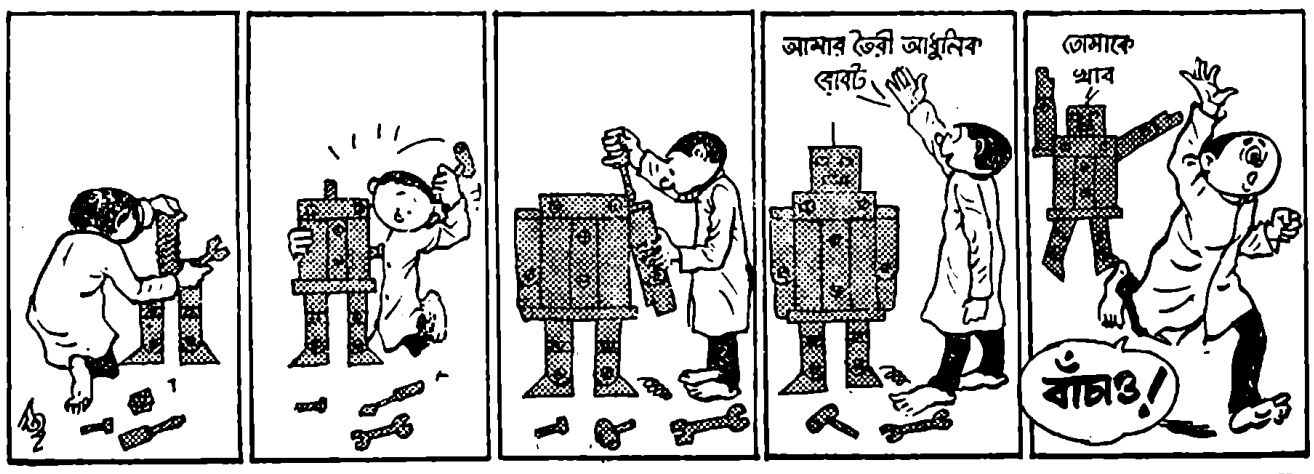

যে ধাতু সোনার চেয়েও দামী ছিল • কমল নন্দী

তোমরা সবাই প্লাটিনামের কথা নিশ্চয়ই ভাবছ, আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। আমি যে ধাতুর কথা বলছি তার এখন মাটির দর। অনেকটা ধাঁধার মত লাগছে তাই না। সত্যিই তাই, কারণ ১৮২৫ সালে এ্যালুমিনিয়ামের দর ছিল ৫০০০ টাকা প্রতি পাউণ্ড। তখন সোনার দাম ছিল অনেক কম। আজকের বাজার দর সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। সোনা ১,৫০,০০০ টাকা কিলো আর আমাদের সেই ধাঁধার ধাতু এ্যালুমিনিয়ামের দর ৩০ টাকা কিলো। ভাবতেও অবাক লাগে ; কি ভাবে সম্ভব হল।

ওহিও প্রদেশের ওবেরলিন কলেজে অধ্যাপক জুয়েট ক্লাসে পড়াতে পড়াতে এই মহামূল্য ধাতুর উল্লেখ করে বলেন যে, হাল্কা অথচ দৃঢ় এবং তাপ বিদ্যুতের সুপরিবাহী এই ধাতুটির প্রচুর ব্যবহার সম্ভব যদি কোনও স্বল্পব্যয়ী নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। তখনকার দিনে সর্বত্রই কাঁঠালি কলার মত লোহার ব্যবহার। তাই ব্যঙ্গ করে তিনি একথাও বলেছিলেন এ্যালুমিনিয়াম সস্তা হলে লোহার এই অপরিহার্যতার গৌরব অনেক হ্রাস হবে। চার্লস মার্টিন হাল ছিলেন তাঁরই এক ছাত্র। হালের মনে কথাগুলি গেঁথে যায়। কেউ কেউ বলেন, হাল ক্লাসের শেষে সহপাঠীদের কাছে উৎসাহভরে বলেছিলেন, "আমিই সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করব।"

কথা তিনি রেখেছিলেন। স্নাতক হবার পরই শুরু হল তাঁর গবেষণা। অধ্যাপক জুয়েটের কাছ থেকে তিনি কয়েকটা ভাঙ্গা রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও কিছু রাসায়নিক যৌগ সংগ্রহ করে তাঁর পৈতৃক বাড়ীর পেছনের কাঠের ঘরে একটা ছোট ল্যাবরেটরী তৈরী করলেন। বেশ কিছুদিন তাঁর কেটে গেল এ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বক্সাইটের ($Al_2O_3, 6H_2O$) দ্রাবকের সন্ধান করতে করতে। তিনি দেখলেন যে গলিত ক্রায়োলাইটে (Na_3AlF_6) খুব সহজেই বক্সাইট দ্রবীভূত হতে পারে। তারপর সমস্যা হল এই দ্রবণ থেকে এ্যালুমিনিয়াম বের করা। অনেক ভাবলেন, নানা রকম চেষ্টাও করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথায় এল, যদি তড়িৎ প্রবাহ পাঠানো যায় তাহলে হয়ত তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন সম্ভব হবে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। এখন প্রয়োজন তড়িৎ কোষের। তখন তড়িৎ কোষের বহুল প্রচলন শুরু হয়নি, যদিও তত্ত্ব ছিল জানা। তাঁর ব্যাটারীগুলো কেমন ছিল জানো ? ভাঙ্গা ভাঙ্গা কাপ, কাচের গ্লাস, তাতে এ্যাসিডে ডোবানো হত দস্তা ও তামার দণ্ড। এই রকম বেশ গোটাকতক তড়িৎ কোষ যুক্ত ক'রে তিনি কোন রকমে একটু তড়িৎ প্রবাহের বন্দোবস্ত করলেন। তারপর গলিত ক্রায়োলাইটে বক্সাইট দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠাতেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে ঋণ তড়িৎদ্বারে এ্যালুমিনিয়াম জমা হচ্ছে। সেদিনটা ছিল ১৮৮৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। মার্টিন হাল তারপর অধ্যাপক জুয়েটের কক্ষে প্রবেশ করলেন, হাতে তাঁর সদ্য নিষ্কাশিত এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর কয়েকটা ছোট ছোট টুকরো। মার্টিনের স্বপ্ন সেদিন সফল হল আর তারই ফলশ্রুতি হল আজকের এই সস্তা এ্যালুমিনিয়াম ও তার বহুল প্রচার।

মার্টিন হাল সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক জুয়েট ও ভগ্নী জুলিয়ার দুটি উক্তি উল্লেখ করে আমরা আলোচনা শেষ করব।

অধ্যাপক জুয়েট তাঁর এই কৃতী ছাত্রের প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমি যখন জাপানে চার বছর শিক্ষানবিসী করে ওবেরলিনে ফিরলাম ১৮৮০ সালে, আমি লক্ষ্য করতাম ১৬ বছরের একটি ছেলে প্রায়ই রসায়নের ল্যাবরেটরীতে এসে মাত্র কয়েক সেণ্টের কাচের নল ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য কিনে নিয়ে যেত। ক'দিন পরে আসত এবং আরও কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যেত। ১৬ বছরের কিশোর মার্টিন দিনের বেশীর ভাগ সময়েই থাকত তার সেই মিনি ল্যাবরেটরীতে। আমার তখনই মনে হয়েছিল মার্টিন ভবিষ্যতে রসায়নের জগতে যুগান্তকারী একটা কিছু করবেই।" অধ্যাপক জুয়েটের সে ধারণা সত্যে পরিণত হয়েছিল, কারণ ১৮৮৬ সালেই অর্থাৎ ২২ বছর বয়সেই মার্টিন এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করে জগদ্বিখ্যাত হয়ে রইলেন।

মার্টিনের বাল্যকাল সম্বন্ধে ওর দিদি জুলিয়া লিখেছেন, ..."যখন ছোট ছেলেরা সবেমাত্র অক্ষর পরিচয় শেষ করে অল্প অল্প পড়তে শুরু করে, সেই সময়ে ভাই আমার বাবার কোর্মাস্টর বইগুলো পড়ত।.....কোনও দিনও দুঃসময়ে সে ভেঙ্গে পড়ল না। দুঃখের দিনে তাঁর নিত্য-সঙ্গী ছিল আমাদের বাড়ীর বহুদিনের পুরানো একটা পিয়ানো। খুব সুন্দর পিয়ানো বাজাত সে। বাড়ীর পেছনে ছোট্ট একটা ঘরে তার গবেষণাগার গড়ে তুলেছিল। দিনরাত সেইখানে ব্যস্ত থাকত। গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে সময় পেত বাড়ীতে এসে একটু পিয়ানো বাজাত। যখন ভাই পিয়ানো বাজাত মনে হত দুটি ভিন্ন-ধর্মী মানুষ পিয়ানো বাজাচ্ছে। একজন সুরের লহরীতে মগ্ন আর সেই সুরের মধ্যে আরেকজন গভীর চিন্তায় গবেষণার সূক্ষ্ম সূত্রের সন্ধানে সমাধিস্থ।"

বিজ্ঞানের ভেলকি

আজব রূপান্তর

যাদু সম্রাট এ. সি. সরকার

রূপকথা আর নানা পৌরাণিক উপখ্যানে পাওয়া যায় রূপান্তর বা চেহারা পরিবর্তনের নানাবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথা। বিশেষ করে রূপকথার কাহিনীতে তো রাক্ষসীরা কথায় কথায় তাদের চেহারা পালটে। কখনো হয় সুন্দরী রাজকন্যে, কখনো পশুপাখি, কখনো বা গাছ, পাথর প্রায়, লতা-পাতা। কখনো বা চোখের সামনে, কখনো বা চোখের আড়ালে নিমেষের মধ্যে রাক্ষসী পালটায় তার চেহারা। গল্পের পাত্র-পাত্রীরা ঘটনা চক্রে শিকার হয় রাক্ষসী বা দৈত্য-দানবের এই অদ্ভুত রূপ পরিবর্তনের।

পৌরাণিক উপাখ্যানগুলোতেও এমনি ধারা রূপ পরিবর্তনের ছড়াছড়ি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই রূপ পরিবর্তন ঘটে দর্শকের চোখের সামনে। দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় ভক্তজন বা অন্য প্রত্যক্ষদর্শীর নাকের ডগায় চোখের সামনে। পুরাণে যে সমস্ত রূপান্তরের কথা আছে তার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে 'দশ মহাবিদ্যা'র ব্যাপারটি।

কাহিনীটা সংক্ষেপে বলা যাক।

দক্ষরাজার কন্যা সতী। তিনি বিয়ে করেছেন মহাদেবকে। দেবাদিদেব মহাদেব। সকল দেবতার তিনি শ্রদ্ধাভাজন। প্রলয়ের দেবতা। কিন্তু হলে কী হবে। দক্ষরাজা মহাদেবকে মোটেই পছন্দ করেন না। গায়ে ছাই মাখা, পরনে বাঘছাল। গাঁজা-ভাঙ-সিদ্ধির নেশায় সর্বক্ষণ চূড়। চাল নেই চুলো নেই, শ্মশানে-মশানে ভূত-প্রেত নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ায়! এমন জামাই দক্ষরাজার দুচোখের বিষ।

সতী কিন্তু মহাদেবের গুণে মোহিত। বহু তপস্যা করে তবে তিনি লাভ করেছেন মহাদেবের মত স্বামী। পতির গরবে তিনি গরবিনী। দু'চোখ ভরে তিনি দেখেন মহাদেবকে। দেখেও যেন দেখার সাধ মেটে না তাঁর।

দক্ষরাজা আয়োজন করেছেন এক বিশাল যজ্ঞের। সসাগরা পৃথিবীর মান্যগণ্য সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব সবার নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ নাই শুধু মেয়ে সতী আর জামাতা মহাদেবের। যেচে অপমান করার জন্যই বুঝি এই ব্যবস্থা।

নারদ হচ্ছেন ঝগড়া লাগানোর ব্যাপারে ওস্তাদ। মজা দেখার জন্য তিনি চুপি চুপি গিয়ে সতীর কানে দিয়ে এলেন যজ্ঞের খবরটা আর তাঁর আর মহাদেবের নিমন্ত্রিত না হবার কথাটা। শুনে তো সতী রেগে আগুন। সব বোনেদের, ভগ্নীপতিদের নিমন্ত্রণ হল আর বাকী পড়লেন কিনা তিনি আর তাঁর স্বামী। না, এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতেই হবে। নিমন্ত্রণ না হয়েছে না হয়েছে তিনি নিজে থেকেই যাবেন বাপের বাড়ি। চাইবেন এই অপমানের কৈফিয়ৎ।

তৈরী হয়ে সতী গিয়ে হাজির হলেন মহাদেবের সামনে। যাবার অনুমতি চাই। মহাদেব অনুমতি দিতে নারাজ। মেয়েমানুষ একা একা যাবে। কী আপদ বিপদ হয় কে জানে। তিনি যে অবলা নন, তিনি যে বিশ্বশক্তির মূলাধার, তার পরিচয় দেবার জন্য স্বামীর সামনে প্রকাশ করেন তাঁর দশ রূপ। মহাদেবের চোখের সামনে দেখতে দেখতে সতী পাল্টে যান কালীরূপে, পর-ক্ষণেই তিনি ধারণ করেন তারা মূর্তি। সেই তারা মূর্তি আবার দেখতে দেখতে পরিবর্তিত হয় ষোড়শী-তে। এইভাবে নিজের মূর্তিকে সতী প্রকাশ করেন একের পর এক দশ রূপে। তাঁর সর্বশেষ রূপ কমলা। চোখের সামনে এই অদ্ভুত রূপান্তরের মহিমা দেখে সতীর তেজ সম্বন্ধে সচেতন হন মহাদেব। তিনি আর আপত্তি করেন না।

যাদুর রাজ্যেও এই রূপান্তর ঘটানোর ব্যাপারটা একটা মামুলী পসন্দ। যাদুকরেরা প্রায়ই এ জিনিসকে ও জিনিসে, ও জিনিসকে সে জিনিসে পাল্টে দিয়ে দর্শকের মাথা ঘুরিয়ে দেন। তবে সেই রূপান্তরের ব্যাপারগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে ঢাকা দেওয়া, চাপা দেওয়া বা আড়াল দেওয়া অবস্থায়। দর্শকদের চোখের সামনে খোলা অবস্থায় কোন কিছুর চেহারা পাল্টিয়ে তাকে অন্য কিছুতে পরিবর্তিত করার যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের ব্যাপারটা খুবই বিরল। হাতের মুঠোয় ধরা এক দেশী মুদ্রার অন্য দেশী মুদ্রায় রূপান্তর। খালি কৌটো বা খালি গেলাসে রাখা এক রঙের রুমালের অন্য রঙ ধারণ বা এমনি ধারা অন্যান্য ব্যাপারাদি খুবই প্রচলিত যাদু রহস্য। কিন্তু চোখের সামনে ধরা একটি মুদ্রা হঠাৎ পাল্টে অন্য দেশীয় মুদ্রা হয়ে যাওয়া বা কোনও পাত্র ব্যবহার না করে সরাসরি দর্শকের চোখের সামনে ধরে থাকা রুমাল বা অন্য বস্তুর রঙ পালটে অন্য রঙ করা তত সহজ সাধ্য কাজ নয়। এর জন্য

প্রয়োজন প্রকৃত যাদু শাস্ত্রের প্রগাঢ় জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভ করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং কঠিন সাধনা নির্ভর ব্যাপার।

বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রভাবে কিন্তু এমনি ধারা প্রত্যক্ষ রূপান্তর ঘটানো যেতে পারে। দেখতে দেখতে চোখের সামনে একটি জিনিস অন্য জিনিস হয়ে গেল। এমন মজা কিন্তু হামেসাই ঘটছে বৈজ্ঞানিকের মায়া-কাঠির স্পর্শে! অন্তর্নিহিত তথ্য সপ্রকাশ বলেই এই সব অদ্ভুত রূপান্তর ম্যাজিক বলে মনে হয় না দর্শকের কাছে। যাদুকরী কায়দায় যাদুকর সুলভ প্রদর্শন ভঙ্গীর মারপ্যাচের ভেতর দিয়ে পরিবেশন করলে এবং সত্যিকারের আদি রহস্য গোপন রাখলে এগুলো এক একটি 'মহা ইন্দ্রজাল' নামে বিখ্যাত হত। এবার শোন এমনি ধারা একটি মজাদার রূপান্তরের আজব ভৌতিক কথা। এই ভৌতিকটা আমি বেলজিয়ামের ওস্টেণ্ড শহরে এক প্রফেসারকে দেখাতে দেখেছিলাম একটি ছোটদের মজলিশে।

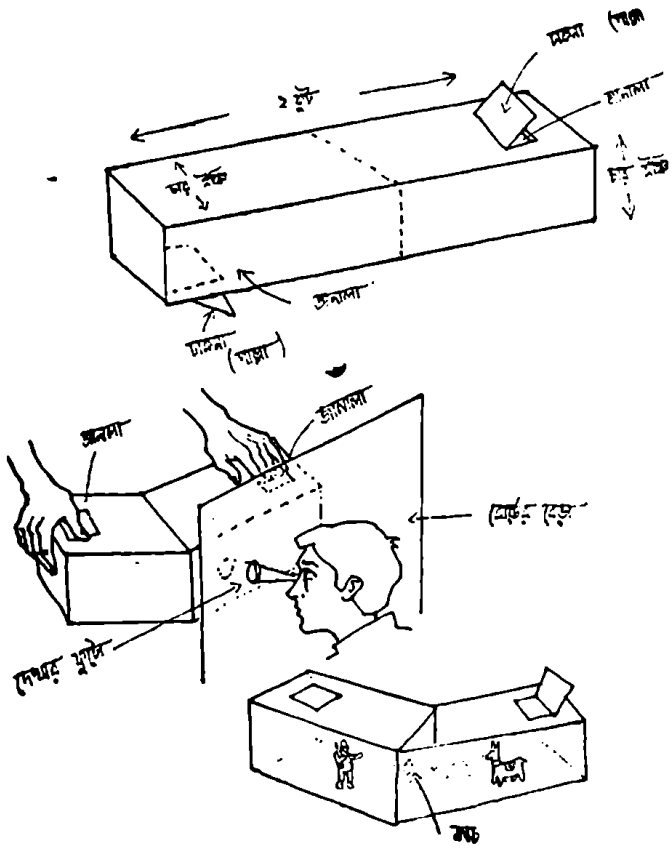

ঘরের কোণে একটা চৌকো পড়ার টেবিল। টেবিলের উপরে সামনের দিকে একটা ফুট তিনেক উঁচু কার্ড বোর্ডের বেড়া। বেড়ার সামনে একটা চেয়ার। প্রফেসারের নির্দেশ মত একটি ছেলে গিয়ে বসলো চেয়ারে। সামনেই কার্ড বোর্ডের বেড়ার গায়ে একটা আধ ইঞ্চি মতন ব্যাসের ফুটো। প্রফেসার বললেন, ছেলেটি তার বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখ এই ফুটোতে ঠেকিয়ে তাকালো ভেতর দিকে।

"কী দেখছো?" প্রশ্ন করলেন প্রফেসার।

"একটা পুতুল ঘোড়া।" জবাব দিল ছেলেটি।

"ভাল করে দেখ। এবার মজার ম্যাজিক হবে। এক পলকের জন্যেও যেন ঘোড়াটাকে নজর ছাড়া কোরো না। আমি মন্তর পড়ছি। 'চাস কি হতে মানুষ রে তুই, ওরে পুতুল ঘোড়া, পছন্দ তোর দেশ বিদেশের শহর-গ্রামে ঘোরা?' কার্ড বোর্ডের বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে বলে চলেন প্রফেসার।

"এবার কী দেখছো?"

"ঘোড়াটা, রূপ বদল করে, আস্তে আস্তে মানুষের মতন হয়ে যাচ্ছে।" অবাক গলায় বলে ছেলেটি।

"এখন কী দেখছো?"

"আর ঘোড়া নেই। ঘোড়াটা একটা সুন্দর সেপাই পুতুল হয়ে গেছে। সুন্দর রং চংয়ে ইউনিফর্ম পরা। কাঁধে বন্দুক!"

প্রফেসারের নির্দেশে ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে আসতে একটি মেয়ে গিয়ে বসে সেখানে, সেও চোখ রাখে বেড়া ফুটোতে। যথারীতি ভেতরে তাকায়।

"কী দেখছো?" প্রফেসার সুধোয়।

"সেপাই পুতুল।" মেয়েটি উত্তর দেয়।

"এবার কী দেখছো?"

"সেপাই পাল্টে যাচ্ছে ঘোড়াতে!"

এই যে ঘোড়া থেকে সেপাই আর সেপাই থেকে ঘোড়াতে রূপান্তরের ব্যাপার এটা কিন্তু ঘটেছে এক বৈজ্ঞানিক সত্যের সূত্রে। আলোক রশ্মির প্রতিফলনের এক অদ্ভুত রকম-ফেরের মাধ্যমেই ঘটে এই রূপান্তর। আলোক রশ্মির প্রতিফলনের এই মজাদার ব্যাপারটা ঘটানোর জন্য একটা বিশেষ ধরনের কার্ডবোর্ডের বাক্স বানিয়ে নিলে তবেই এই মজাটা তোমরাও করতে পারবে। এবার বোল কেমন করে এই বিশেষ 'ম্যাজিক বাক্স'টা বানাবো। পড়বার টেবিলের সামনে কার্ডবোর্ডের এক ফুটোওয়ালা বেড়া লাগিয়ে, তার পেছনে প্রফেসার বসিয়েছিলেন এই কার্ডবোর্ডের 'ম্যাজিক বাক্স'। এই ম্যাজিক বাক্সের দৌলতেই তিনি দেখিয়েছিলেন এই রূপান্তরের মজা।

প্রথমে সংগ্রহ করো খানিকটা কার্ডবোর্ড, কিছুটা

পাতলা শক্ত কাপড়, আঠা আর ছুরি-কাচি। বোর্ড কেটে, আঠা-কাপড় কালি দিয়ে জুড়ে আগে বানাও দুই ফুট লম্বা, চার ইঞ্চি উঁচু একটা লম্বাটে বাক্স। বাক্সের খোলা দুটো মুখ কার্ডবোর্ডের টুকরো সেঁটে বন্ধ করে দাও। বাক্সটার উপর পিঠে. এক দিককার প্রান্তের কাছাকাছি তিন ইঞ্চি লম্বা আর তিন ইঞ্চি চওড়া একটা জানালা কাটো। যে প্রান্তে জানালাটা কাটলে তার ঠিক উল্টো প্রান্তে বাক্সের নিচের পিঠের দেওয়ালে, প্রান্ত থেকে একই দূরত্বে ঠিক একই মাপের আর একটা জানালা কেটে নাও। যে মাপের জানালা কেটেছো তার চেয়ে বেশ কিছু বড় মাপের দুটো বোর্ডের টুকরো নিয়ে, কাপড়ের ফালিতে আঠা মাখিয়ে তাকে কব্জার মত ব্যবহার করে, জানালা দুটোতে পাল্লা হিসাবে লাগিয়ে নাও। এর পরের কাজটুকু একটু কঠিন।

এবারে বাক্সটাকে এই অবস্থায় মাঝ বরাবর তেরছা ভাবে দুই সমান ভাগে কাটতে হবে। এই তেরছা ভাবটা হবে ঠিক পঁয়তাল্লিশ (৪৫) ডিগ্রী কোণের মাপে। মাপে গোলমাল হলে কিন্তু চলবে না। খুব সাবধান!

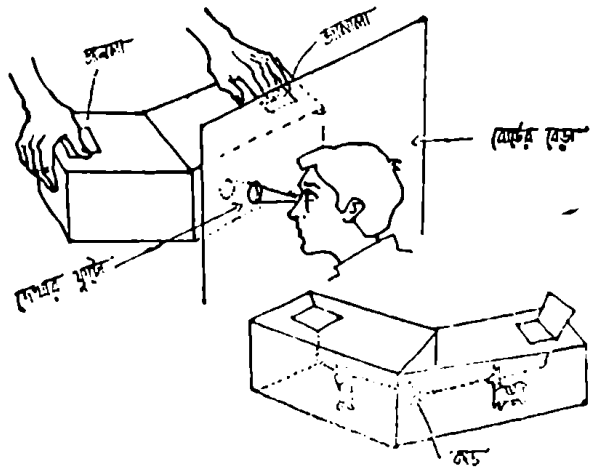

যে অংশে জানালাটা নিচে পড়েছে, সেই অংশটা সোজা করে তুলে এনে অন্য অংশটার পাশে রেখে এবার কাটা বাক্সের দুই ভাগের তেরছা ধার দুটো আঠামাখা কাপড়ের ফালির সাহায্যে এখন একত্র জুড়তে হবে। জোড়াটা এমন হবে যেন দুই অংশ তাদের মিলন বিন্দুতে নব্বই (৯০) ডিগ্রী সমকোণের সৃষ্টি করে। বাক্সের দুই টুকরোর মিলন রেখাতে একটু ফাঁক রেখে সেই ফাঁক দিয়ে গলাতে হবে একটি স্বচ্ছ পরিষ্কার সঠিক মাপের কাচের চৌকো টুকরো। এই কাচ, দুই টুকরো বাক্সের সঙ্গমস্থলে একটি স্বচ্ছ সীমানা-প্রাচীর গড়ে তুলে রহস্যের লীলাখেলা দেখাবে। সঙ্গম রেখার থেকে ইঞ্চি দুয়েক দূরে একদিকের খাড়া দেওয়ালে একটা খাড়া সরল রেখা টেনে নিয়ে আর সেই সরল রেখাকে কেন্দ্র করে এবার একটি এক ইঞ্চি ব্যাসের বৃত্ত এঁকে নাও। এই বৃত্তের পরিধি বরাবর ব্লেড চালিয়ে একটা গোল ফুটো করে নিলেই এখন তোমার 'ম্যাজিক বাক্স' কাজের উপযুক্ত হয়ে যাবে।

ধরতে গেলে এখন এই বাক্সে আছে দুটো কামরা। ডান কামরা বাঁ কামরা। ছোট অথচ একই মাপের দুটো দু রকমের পুতুল নিয়ে তার একটাকে জানালা গলিয়ে বসিয়ে দাও ডান কামরায়। অন্যটাকেও একই ভাবে বসাও বাঁ কামরায়। টেবিলে কার্ডবোর্ডের বেড়া লাগিয়ে, তাতে সঠিক মাপে ফুটো করে, সেই ফুটোর ঠিক পেছনে ঠেকিয়ে রাখো 'ম্যাজিক বাক্স'র ফুটো। দর্শক যখন চেয়ারে বসে বেড়ার ফুটোতে এক চোখ ঠেকাবে তখন বাঁ কামরার উপরকার জানালার পাল্লাটা তুলে ধরবে। বাঁ কামরার পুতুলটা দর্শকের নজরে পড়বে। এর পর ধীরে ধীরে বাঁ কামরার জানালা বন্ধ করতে থাকবে আর ঠিক একই গতিতে খুলতে থাকবে ডান কামরার জানালা। বাঁ কামরা আঁধার হতে হতে বাঁ কামরার পুতুল আঁধারে মিলিয়ে যাবে আর তার জায়গায় দর্শকের নজরে ধরা দেবে ডান কামরার পুতুলটা। মনে হবে যেন ঘোড়া ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছে সেপাইতে।

ব্যাপার কী হয় জানো? ডান কামরার জানালা খোলা থাকা অবস্থায় বাঁ কামরার জানালা বন্ধ থাকলে দর্শকের নজর কাচের দেওয়াল ভেদ করে ডান কামরার পুতুল দেখতে পায়। ডান কামরা অন্ধকার হয়ে গেলেই কাচের দেওয়ালটা আয়নার মত অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। আলোকিত ডান কামরার পুতুল তখন প্রতিফলিত হয় এই আয়নাতে আর দর্শক সেই পুতুল দেখে। সাবধানে 'ম্যাজিক বাক্স'টা বানিয়ে নাও। খুব মজা পাবে এ দেখিয়ে।

সেলিমপুর রোড—কলকাতা-৩১

সমরজিৎ করের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের চরিতকথা
নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী—১৫·০০
প্রকাশিত হয়েছে ॥ শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ কলকাতা ৭৩।

কৃতী বিজ্ঞানী লিনাস পাউলিং • বিবেক রায়

প্রথমে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার এবং পরে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার গৌরব যে বিজ্ঞানী লাভ করেছেন, তিনি হলেন 'লিনাস পাউলিং'। 1901 সালের 28শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন স্টেটের পোর্টল্যাণ্ডে লিনাস পাউলিং-এর জন্ম হয়। গরীবের ছেলে। বাপ এক ওষুধ প্রস্তুতকারকের কোম্পানীতে সেল্‌সম্যান-এর কাজ করতেন। সামান্য বেতন পেতেন। সংসার চলতো কষ্টে সৃষ্টে।

লিনাস- এর বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। লিনাস তখন ন' বছরের বালক। সংসারে বিধবা মা, লিনাস এবং তাঁর দুই ছোট বোন। চারজনের সংসার চলবে কি করে?— বাধ্য হয়ে বালক লিনাসকে রোজগারের চেষ্টা করতে হলো। প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর লিনাস বাড়ী বাড়ী গিয়ে দুধ পৌঁছে দিয়ে আসতেন। তাতে সামান্য যা রোজগার হতো তা লিনাস তুলে দিতেন তাঁর মায়ের হাতে সংসার খরচের জন্যে। মা লিনাসকে গল্প শোনাতেন। কি ভাবে লিনাসের দাদামশাই ছেলেবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে জয়ী হয়েছিলেন, মহামান্য জজরূপে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন— এ সব গল্প শোনাতেন। শোনাতেন সাহসিকতার গল্প, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার গল্প।

বই পড়তেও খুব ভালবাসতেন লিনাস। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এবং বন্ধুদের কাছ থেকে বই চেয়ে এনে পড়তেন। সব রকমের বই-ই তিনি পড়তেন, তবে বিজ্ঞানের বই-ই ছিল তাঁর সবচেয়ে পছন্দ। তড়িৎ বিজ্ঞানের উপর লেখা বই, যন্ত্রপাতি, গাছপালা, পাথর ইত্যাদি বিষয়ক বই পড়তে খুব ভালবাসতেন তিনি। লিনাসের বিজ্ঞান চর্চায় সাহায্য করতেন তাঁর সহপাঠী বন্ধু 'লয়েড জেফ্‌স'।

লয়েড বাস করতেন তাঁর কাকা-কাকিমার সঙ্গে। তাঁর কাকা-কাকিমারও বিজ্ঞান প্রীতি কম ছিল না। তাঁরা সময় পেলেই লয়েড আর লিনাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। লয়েডদের বাড়ীতে লয়েডের কাকা ছোটখাটো একটা রসায়নাগার স্থাপন করেছিলেন। লিনাস ও লয়েড প্রত্যহ সেই রসায়নাগারে গিয়ে একসঙ্গে রসায়ন বিজ্ঞানের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন।

স্কুলের পড়া শেষ ক'রে লিনাসকে সংসার চালাবার জন্যে বাধ্য হ'য়ে মেকানিকের বৃত্তি গ্রহণ করতে হলো, কিন্তু মনে মনে তিনি কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হবার স্বপ্ন দেখতেন। মা তখন খুবই অসুস্থ। ছেলের রোজগারেই সংসার চলে অতি কষ্টে। এমন সময় ছেলে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বাইরে যাক্ —এটা তাঁর মনঃপূত ছিল না। লিনাস কিন্তু মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে কলেজে ভর্তি হলেন। তাই বলে সংসারের দায় দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন না। কলেজের ছুটি হওয়া মাত্রই লিনাস রোজগারের উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়ে পড়তেন। কারও বাড়ীতে ঘর মোছার কাজ করতেন, আবার কারও বাড়ীতে জ্বালানি কাট কাটতেন। এই সব কাজ ক'রে দিনান্তে যে রোজগার হতো, তা দিয়ে অতি কষ্টে তিনি সংসার খরচ ও নিজের পড়ার খরচ চালাতেন। এই সময় অনেকদিন তাঁকে একবেলা খেয়ে কাটাতে হতো। বেশীর ভাগ দিন রাতে আহারই জুটতো না তাঁর। কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি হলে লিনাস রাস্তা তৈরির ঠিকাদারের ফার্মে চাকরি নিতেন। কুলি-মজুর খাটতেন, রাস্তা তৈরির তদারকি করতেন। ছুটির দিনগুলিতে রোজগার ভালই হতো।

কলেজে ছাত্রাবস্থায় এক বিখ্যাত রসায়নবিদের লেখা একটি রচনা পড়ে লিনাস রসায়নবিদ হতে কৃতসংকল্প হন। শুধু তাই নয়, তিনি স্থির করে ফেলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর গঠনের মূল উপাদান অণু-ই হবে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। তখনকার দিন পর্যন্ত অণুর ক্রিয়াকলাপ, বিভিন্ন পদার্থের অণুর গঠন ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে লিনাস পাউলিং ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজিতে শিক্ষকতা ও সেই সঙ্গে গবেষণা করার সুযোগ পান। ওখান থেকেই তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। বিয়ে করেন নিজের এক ছাত্রীকে।

ছাত্রাবস্থাতেই লিনাস বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি বিষয়ের জ্ঞান অপর বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞানকে অনুধাবন করতে সহায়তা করে। এটা বুঝতে পেরে পরবর্তী জীবনে লিনাস পাউলিং মানব দেহের ক্রিয়া-

কলাপ অনুধাবন করতে রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও জীবন বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

গবেষণাকালে পাউলিং অজস্র যৌগ, এবং স্ফটিকের গঠন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই সব পদার্থের অণুতে পরমাণুর সজ্জা কি রকম, তা লক্ষ্য করেছিলেন। এ ভিন্ন তিনি 'রাসায়নিক বন্ধন' সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। এই তত্ত্ব থেকে বোঝা যায়, অণুর মধ্যে পরমাণুগুলি কি ভাবে পারস্পারিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। 1939 সালে "রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতি" শীর্ষক এক দীর্ঘ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন পাউলিং। বিজ্ঞানী মহলে তাঁর এই গবেষণাপত্রটি সমাদৃত হয়।

এই তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্যেই তিনি 1954 সালে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পরবর্তীকালে লিনাস পাউলিং মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ, যথা চুল, রক্ত, জীবিত কোষ ইত্যাদির জটিল অণুর অভ্যন্তরস্থ পরমাণুবিন্যাস পর্যবেক্ষণ করেন। পরীক্ষার দ্বারা তিনি দেখান যে, দেহের রোগগ্রস্ত অংশের অণুর অন্তর্গত পরমাণুগুলির বিন্যাস, সুস্থ দেহের সেই অংশের অণুর মূল পরমাণু বিন্যাস হতে স্বতন্ত্র। পরমাণু বিন্যাসের এই পার্থক্য পর্যবেক্ষণ ক'রে বহু রোগের কারণ নির্ণয় করা সহজতর হয়। মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ করবার স্বাভাবিক ক্ষমতার মূলে যে রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ আছে তাও পাউলিং অনুধাবন করেন। তাঁর এই সব গবেষণার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অনেকটা বুঝতে পারেন। ভবিষ্যতে এই জ্ঞান মানুষের অনেক রোগ নিরাময়ের সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টির উপর আমেরিকা বর্ষণ করলো পরমাণু বোমা। সেই বোমার ভয়াবহ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে লিনাস পাউলিং যৎপরনাস্তি মর্মাহত হলেন। তিনি চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলেন না। পরমাণু বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তিনি সস্ত্রীক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এবং একাধিক ইউরোপীয় দেশ পরিভ্রমণ করলেন। সর্বত্রই তিনি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে জনমত গঠন করতে লাগলেন। সাধারণ মানুষকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয় রশ্মি সমূহ মানব দেহের পক্ষে নিদারুণ ক্ষতিকর। পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিবাদে পাউলিং দেশে-বিদেশে বহু প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করলেন। বিশ্বের সব দেশ থেকেই তিনি এ ব্যাপারে পেলেন সমর্থন। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে এই দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যে আমেরিকান সরকার পাউলিংকে ঘন ঘন বিদেশে যাবার ছাড়পত্র মঞ্জুর করেন নি। তবুও পাউলিং নিরস্ত হন নি। মহান ব্রত নিয়ে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস হিসাবে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই রইলেন। তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। 1963 সালের 10ই অক্টোবর তারিখে বিশ্বের পারমার্ণাবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ সীমিতভাবে বন্ধ রাখতে সম্মত হলেন। আর এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে লিনাস পাউলিং কে 1963 সালে 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হলো।

1964 সালে লিনাস পাউলিং 'ক্যালিফোর্নিয়া ইন্‌স্টিটুট অফ টেকনোলজি' থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং বাকি জীবন মানুষের রোগ দূর করার উদ্দেশ্যে গবেষণা চালাবেন বলে স্থির করেন। এই উদ্দেশ্যে 1973 সালে সান-ফ্রান্সিসকোতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'লিনাস পাউলিং ইনস্টিট্যুট অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড মেডিসিন' নামে এক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে তাঁর বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল প্রকাশ ক'রে তিনি বিশ্ববাসীকে জানান যে, পুষ্টিকর খাদ্য যে কেবল মানুষের দেহকে রোগমুক্ত রাখে তা নয়, পরমায়ুকেও বাড়ায়। পরিমিত 'ভিটামিন-সি' সেবন করলে সাধারণ সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এটাও লিনাস পাউলিং-এর গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত।

এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাদর্শ দেশ-বিদেশের সকল বিজ্ঞানীকে অনুপ্রাণিত করবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরবর্তী সংখ্যা থেকে

বিজ্ঞানভিত্তিক রচনার অন্যতম পথিকৃৎ

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের

ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু হবে

গ. সা. গু. নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি

নন্দলাল মাইতি

স্থানীয় প্রগতি সঙ্ঘের বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হবে। এতদিন এই সঙ্ঘের কর্মকর্তারা খেলাধূলা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কেন জানি না ওঁরা হঠাৎ বিজ্ঞান বিভাগ খোলার মনস্থ করলেন। প্রগতির অনেক কর্মকর্তার সঙ্গেই আমার আগে থেকে পরিচয় ছিল। একদিন বাড়ি ফেরার পথে ওদের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি এগিয়ে এসে বললেন,—"স্যার, আমাদের আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন?"

আমি বললাম,—"হ্যাঁ, পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ তোমরা বিজ্ঞান বিভাগ খোলার সংকল্প করলে কেন?"

সম্পাদক মশায় একটু হাসলেন এবং বললেন,—"সে অনেক কথা। আপনি ওইদিন অবশ্যই আসুন। অনেক আলোচনা হবে।"

কথা না বাড়িয়ে বাড়ি চলে এলাম। হাতমুখ ধুয়ে সবে চা নিয়ে বসেছি, এমন সময় সমীর এসে বলল,—"কাকু, ডঃ এন. সি. সেন কে?"

আমি বললাম,—উনি গণিতের একজন বড় অধ্যাপক। কলেজে পড়ান। আর সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারেন।

সমীর বলল,—আমি আপনার সঙ্গে ক্লাবের মিটিং-এ যাব। "গ.সা.গু. নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি" সম্বন্ধে উনি কি বলেন শুনব।

আমি বললাম,—বেশ তো যেও। এরকম বক্তৃতা শোনা তো তোমাদের দরকার। আর তোমাদের জন্যেই তো ক্লাবের কর্তৃপক্ষ এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন।

যথারীতি সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে প্রগতির সম্পাদক ক্লাবের বিজ্ঞান বিভাগ খোলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু-চার কথায় জানালেন দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি প্রধানত বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তাই বিজ্ঞান বিষয়ে সবার সচেতনতা থাকা দরকার। এই বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা বা মানসিকতা ছোটবেলা থেকে গড়ে না উঠলে, বিজ্ঞানে বিশেষ আগ্রহী হয়ে না উঠলে বিজ্ঞানে সাফল্যলাভ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ধারণা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। তাই প্রগতির কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান মনস্কতার গুরুত্বপূর্ণ দিকটির কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার সংকল্প করেছেন, এবং আজকের এই উদ্বোধনী দিনে জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন।

তাঁর ছোট্ট ভাষণ শেষ হবার পর জনপ্রিয় বক্তৃতা,—"গ.সা.গু. নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি" সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে উঠলেন ডঃ এন. সি. সেন। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও শ্রোতৃবর্গকে যথাবিহিত সম্ভাষণের পর তিনি বললেন,—আজ যে বিষয়টির উপর আমায় কিছু বলতে আহ্বান করা হয়েছে, সেই বিষয়টি অতি সাধারণ এবং সবার জানা। বিষয়টি অভিনব কিছু নয়, আর এর দুটি পদ্ধতিও আমরা জানি। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী থেকেই গ. সা. গু. নির্ণয় করতে শেখানো হয়। গ. সা. গু. কথাটির অর্থও সবার জানা,—গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক।

ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার গ. সা. গু. নির্ণয় করতে হয়। এ-বিষয়ে কিছু সমস্যাজনিত অঙ্ক, বিশুদ্ধ সংখ্যার অঙ্ক ইত্যাদি থাকে। সত্যি কথা বলতে কি পাটীগণিতের গ. সা. গু. সম্পর্কিত অঙ্কগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন সমস্যায় ফেলে না। কিন্তু যখন সপ্তম শ্রেণী থেকে বীজগণিত শুরু হয়, এবং অষ্টম, নবম শ্রেণীতে বীজগণিতের গ. সা. গু. নির্ণয় করতে হয়, তখন ছাত্র-ছাত্রীরা গ. সা. গু. নির্ণয় করতে বেশ অসুবিধা বোধ করে। এই অসুবিধার প্রধানত দুটি কারণ:

(১) উৎপাদকের সাহায্যে গ. সা. গু. করতে গিয়ে অনেক সময় তারা সব রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে পারে না। গ. সা. গু. নির্ণয় করতে গেলে কমপক্ষে দুটি রাশি দেওয়া থাকেই। দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা হয়তো একটি রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে পারল, আর একটির পারল না।

(২) পর্যায়ক্রমে ভাগ করেও গ. সা. গু. নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতি অনেক সময় দীর্ঘ হয়ে পড়ে, আর নানা জটিলতা দেখা যায়। বিশেষ করে পর্যায়-ক্রমিক ভাগটি দীর্ঘ হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। বস্তুতপক্ষে, এই পদ্ধতি নিছক যান্ত্রিক। এতে

বুদ্ধির খেলা নাই, যুক্তি-তর্ক বিকাশের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। অঙ্কে যান্ত্রিকতা বিশেষভাবে বর্জন করা উচিত। তা না হলে গণিতে পারদর্শিতা, দক্ষতা ও সাফল্য লাভ করা যায় না।

এই পর্যন্ত বলে ডঃ সেন উপস্থিত কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশে বললেন,—ছোট্ট সোনার বন্ধুরা, তোমরা কি বল?

শুকদেব নামে একটি কিশোর উঠে বলল,—আপনি আমাদের অসুবিধার কথা ঠিক বলেছেন।

আবার অধ্যাপক ডঃ সেন শুরু করলেন,—তাই এমন একটি পদ্ধতি যদি থাকে যেখানে উৎপাদক বিশ্লেষণের জটিলতার মধ্যে যেতে হয় না, আবার কেবল ভাগ করার মত নীরস ও একঘেয়েমী কাজটিও করতে হয় না, তা হলে কেমন হয়?

এই প্রস্তাবে সবাই স্ফুট-অস্ফুট স্বরে আগ্রহভরে সম্মতি জানাল।

চক-ডাস্টার হাতে নিয়ে ডঃ সেন বললেন,—আমি এরকম একটি মাঝামাঝি পদ্ধতির কথা বলব। একে "বৈদিক পদ্ধতি" বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতির আবিষ্কারক হচ্ছেন শঙ্করাচার্য ভারতীকৃষ্ণ। গ. সা. গু. নির্ণয়ে যে ছোট্ট সূত্রটি ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে "লোপন-স্থাপন"। তোমরা হয়তো দেখে থাকবে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জানুয়ারী সংখ্যায় এই সূত্রটি উৎপাদক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছিল। "লোপন-স্থাপন"-এর অর্থ অপসারণ ও সংরক্ষণ। কিন্তু গ. সা. গু. নির্ণয়ের বেলায় সূত্রটি সামান্য পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সূত্রটির অর্থ হচ্ছে পর্যায়ক্রমে উচ্চ ও নিম্ন ঘাতের অপসারণ।

শ্রোতৃবর্গ নিশ্চুপ। আমিও কৌতূহল নিয়ে ডঃ সেনের পরের কথাগুলি শোনার অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণছি। ডঃ সেন নাকের ডগা থেকে চশমা উঠিয়ে আরম্ভ করলেন,—পর্যায়-ক্রমে "উচ্চ ও নিম্ন ঘাতের অপসারণ" বলতে কি বোঝায় তা জানতে নিশ্চয় তোমাদের কৌতূহল হচ্ছে। কি বল ছোট্ট সোনা বন্ধুরা?

মৈনুল বলল,—আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

অধ্যাপক ডঃ সেন একবার সব শ্রোতার মুখের উপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন যেন। মনে হল, তিনি যেন যাচাই করে নিচ্ছেন সত্যিই সবাই শুনতে আগ্রহী কিনা। তারপর একটু গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন,—মনে কর, E_1 এবং E_2 দুটি রাশিমালা যাদের গ. সা. গু. নির্ণয় করতে হবে। এখন "উচ্চ ঘাতের অপসারণ" বলতে বোঝাবে E_1 থেকে E_2 বিয়োগ করা; আর "নিম্ন ঘাতের অপসারণ" বলতে বোঝাবে E_1 ও E_2 যোগ করা। অবশ্য এটিই সাধারণ নিয়ম। তোমরা তো জান নিয়মের কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়। যাকগে সে কথা। এখন, একটি উদাহরণের সাহায্যে সাধারণ নিয়মটির প্রয়োগ দেখানো যাক।

বক্তা চক-ডাস্টার নিয়ে বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর লিখতে লিখতে বললেন,—মনে কর, x^2+7x+6 এবং x^2-5x-6 এই দুটি রাশিমালার গ. সা. গু. নির্ণয় করতে হবে। যদিও "আদ্যাম্ভোন" বা মধ্যপদের বিশ্লেষণ দ্বারা এই রাশি দুটির উৎপাদক বিশ্লেষণ খুব সহজ, তবুও এখানে কেমন করে "লোপন-স্থাপন" সূত্র প্রয়োগ করা যায়, তা দেখাব। কারণ, একইভাবে জটিলতর রাশির ক্ষেত্রেও সূত্রটি প্রয়োগ করা যাবে। হ্যাঁ, বামদিকে উচ্চতম ঘাতের অপসারণ অর্থাৎ E_1-E_2 দেখানো হচ্ছে, আর ডানদিকে নিম্নতম ঘাতের অপসারণ অর্থাৎ E_1+E_2 দেখানো হচ্ছে।

$$E_1-E_2=\begin{array}{l|l} x^2+7x+6 & \\ x^2-5x-6 & \\ \hline 12 & 12x+12 \\ & \hline & x+1 \end{array}$$

$$E_1+E_2=\begin{array}{l|l} x^2+7x+6 & \\ x^2-5x-6 & \\ \hline 2x & 2x^2+2x \\ & \hline & x+1 \end{array}$$

এখন, দেখ, বামদিক ও ডানদিক $x+1$ জ্বলজ্বল করছে। আর আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে সে হচ্ছে প্রদত্ত রাশিমালা দুটির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গ. সা. গু.। বৈদিক পদ্ধতির এটাই সুবিধে যে উত্তর খুঁজতে হয় না, সে আপনি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে।

হঠাৎ অরূপ প্রশ্ন করল,—স্যার, বামদিকের 12 আর ডানদিকের $2x$-এর কি মূল উত্তরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই?

বক্তা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং বললেন,—বেশ ভাল প্রশ্ন করেছ। উৎপাদকের সাহায্যে গ. সা. গু. নির্ণয় করতে হলে 12 ও $2x$-এর গ. সা. গু. করে দিতে হয়। কিন্তু বৈদিক পদ্ধতিতে তার কোন প্রয়োজন নাই। "কমন ফ্যাক্টর" বা সাধারণ উৎপাদক এখানে অপসারিত হয়। হ্যাঁ, আর কোন প্রশ্ন কেউ করবে?

তখন নভেন্দু উঠে বলল,—আপনি আরো জটিল ধরনের রাশি নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়। বিশেষ করে ত্রিমাত্রিক রাশি। এরকম রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ আমাদের কাছে কঠিন বলে মনে হয়।

অধ্যাপক স্মিত হেসে বললেন,—প্রচলিত পদ্ধতিতে

ত্রিমাত্রিক রাশির উৎপাদক বিশ্লেষণ একটু জটিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তারও একটা সহজ পদ্ধতি আছে, তোমরা বোধ করি পড়েছ। সে যাই হোক, উৎপাদক বিশ্লেষণ না করে, এমন কি ভাগ না করেও কিভাবে "লোপন-স্থাপন" সূত্রের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক রাশির গ. সা. গু. নির্ণয় করা যায় আলোচনা করা যাক।

মনে কর, $x^3-3x^2-4x+12$ ও $x^3-7x^2+16x-12$ এই দুটি ত্রিমাত্রিক রাশির গ. সা. গু নির্ণয় করতে হবে। ঠিক আগের অঙ্কটির মত এখানে,—

$$E_1-E_2=\begin{array}{l|l} x^3-3x^2-4x+12 & \\ x^3-7x^2+16x-12 & \\ \hline 4 & 4x^2-20x+24 \\ \hline & x^2-5x+6 \end{array}$$

$$E_1+E_2=\begin{array}{l|l} x^3-3x^2-4x+12 & \\ x^3-7x^2+16x-12 & \\ \hline 2x & 2x^2-10x^2+12x \\ \hline & x^2-5x+6 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় গ. সা. গু. x^2-5x+6।

এতক্ষণ কিশোর-কিশোরীরা প্রশ্ন করছিল। আমি চুপচাপ বসে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। কিন্তু আর চেপে থাকতে পারলাম না। বললাম,—অধ্যাপক সেন, এই ত্রিঘাত রাশির ক্ষেত্রে আপনি যে উদাহরণ দিলেন, তাতে উচ্চতম ঘাত x^3-*এর সহগ দুটি রাশিতেই সমান। কিন্তু যদি সহগ* সমান না হয়, তা হলে কিরকম হবে?

অধ্যাপক সেন বললেন,—আমি আপনার প্রশ্নটি ছোট্ট বন্ধুদের কাছ থেকে আশা করছিলাম। যা হোক,—ভালই হয়েছে। অবশ্য আপনি না প্রশ্ন করলেও আমি এ প্রসঙ্গে আসতাম। তবু আপনার প্রশ্নটির জন্য ধন্যবাদ।

তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে প্যান্টটা একটু উপরে তুলে বললেন,—'লোপন-স্থাপন' সূত্রের প্রধান কথা হচ্ছে একদিকে উচ্চতম ঘাতের অপসারণ, অপর দিকে নিম্নতম ঘাতের অপসারণ। অর্থাৎ "অপসারণ" হচ্ছে মূলকথা। অপসারণ করতে গেলে উচ্চতম ঘাতের সহগ সমান হওয়া চাই। যদি প্রদত্ত রাশিমালা দুটিতে অসমান সহগ থাকে, তাহলে এমন সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে যা দিয়ে একটি রাশি বা দুটি রাশিকে গুণফল করলে উচ্চতম ঘাতের সহগ সমান হয়। তারপর অবশ্য আর কোন ঝামেলা নাই। আগের মত অঙ্ক কষে গেলেই চলবে।

এবার একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট করা যাক।

গ. সা. গু. নির্ণয় কর

$4x^3+13x^2+19x+4$ এবং $2x^3+5x^2+5x-4$

এখানে, $4x^3$ ও $2x^3$ এই দুটি উচ্চতম ঘাতের সহগ সমান নয়। তা হলে $2x^3$-কে 2 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে। অবশ্য কেবল $2x^3$-কেই নয়, সমগ্র রাশিমালাকে 2 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে। প্রক্রিয়াটি লিখে দেখাই,—

$$E_1-E_2=\begin{array}{l|l} 4x^3+13x^2+19x+4 & \\ 4x^3+10x^2+10x-8 & \\ \hline 3 & 3x^2+9x+12 \\ \hline & x^2+3x+4 \end{array}$$

$$E_1+E_2=\begin{array}{l|l} 4x^3+13x^2+19x+4 & \\ 2x^3+5x^2+5x-4 & \\ \hline 6x & 6x^3+18x^2+24x \\ \hline & x^2+3x+4 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় গ. সা. গু. x^2+3x+4।

আর আমাদের প্রশ্ন করতে হলো না। অধ্যাপক নিজেই বললেন,—এবার দুটি রাশিমালা যখন অসমমাত্রার হবে, তখন কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে, সে-বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

দুটি রাশিমালা অসমমাত্রার হলে উপযুক্ত সহগ ও চল নির্বাচন করে সমমাত্রায় ও সমসহগে পরিণত করে নিতে হবে। যেমন, $6x^4-7x^3-5x^2+14x+7$ ও $3x^3-5x^2+7$ এই দুটি রাশিমালার ক্ষেত্রে $3x^3$-কে $2x$ গুণ করে নিলে উচ্চতম ঘাতের সহগ ও মাত্রা সমান হবে। এটি একটি বিশেষ অঙ্ক। দেখ,—কেবল বামদিকের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেই উত্তর হয়ে যায়।

$$E_1-E_2=\begin{array}{l|l} 6x^4-7x^3-5x^2+14x+7 & \\ 6x^4-10x^3\quad\quad+14x & \\ \hline & 3x^3-5x^2\quad\quad+7 \end{array}$$

$E_2=3x^3-5x^2+7$

∴ নির্ণেয় গ. সা. গু $3x^3-5x^2+7$।

অরূপ জিজ্ঞাসা করে,—স্যার, সব অঙ্কই কি এত সহজে হবে? অধ্যাপক বললেন,—না, তা হবে না। অঙ্কের কিছু জটিলতা তো আছে। তবে বৈদিক পদ্ধতিতে জটিলতা কম। এতক্ষণ আমরা যে-সব উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করলাম, তাতে জটিলতা নাই, আর অঙ্কও দীর্ঘ নয়, কিন্তু কোন কোন অঙ্ক কষতে গেলে হয়তো একটি মাত্র সোপানে (Step) হবে না, একাধিক সোপানের দরকার হয়ে পড়বে। এমন ধরনের একটি অঙ্ক নিয়ে জটিলতা বুঝে নেওয়া যাক।

উদাহরণ : $x^4+x^3-5x^2-3x+2$

এবং $x^4-3x^3+x^2+3x-2$

$$E_1-E_2=\begin{array}{r|l} & x^4+x^3-5x^2-3x+2 \\ & x^4-3x^3+x^2+3x-2 \\ \hline 2 & 4x^3-6x^2-6x+4 \\ \hline & 2x^4-3x^2-3x+2 \end{array}$$

$$E_1E_2=\begin{array}{r|l} & x^4+x^3-5x^2-3x+2 \\ & x^4-3x^3+x^2+3x-2 \\ \hline 2x^3 & 2x^4-2x^3-4x^2 \\ \hline & x^2-x-2 \end{array}$$

ডান দিক থেকে দেখা যাচ্ছে 'লোপন স্থাপন' সূত্র প্রয়োগের ফলে উচ্চতম ঘাতের অপসারণ হয়ে x^2-x-2 রাশি পাওয়া গেছে। কিন্তু বামদিকে E_1-E_2 প্রয়োগ করে নিম্নতর ঘাত পাওয়া যায়নি। কারণ, বামদিকের রাশির ঘাত তিন, আর ডানদিকের রাশির ঘাত দুই। সুতরাং যে কোন প্রকারে বামদিকের রাশিকে আরো নিম্নতম ঘাতে পরিণত করতে হবে : এ ক্ষেত্রে x^2-x-2-কে $2x$ দিয়ে গুণ করে $2x^3-3x^2-3x+2$ থেকে বিয়োগ করলে তবেই অভিলষিত ফল পাওয়া যাবে। অতএব, বামদিকের সমগ্র প্রক্রিয়াটি এরূপ হবে :

$$E_1-E=\begin{array}{r|l} & x^4+x^3-5x^2-3x+2 \\ & x^4-x^3+x^2+3x-2 \\ \hline 2 & 4x^3-6x^2-6x+4 \\ \hline & 2x^3-3x^2-3x+2 \\ & 2x^3-2x^2-4x \\ \hline -1 & -x^2+x+2 \\ \hline & x^2-x-x \end{array}$$

এখন, E_2-E_3 ও E_1+E_3 এই দুটি প্রক্রিয়ার শেষ ফল হচ্ছে x^2-x-2। সুতরাং x^2-x-x প্রদত্ত রাশি-মালা দুটির গ. সা. গু.।

এক্ষণে বৈদিক পদ্ধতির সৌন্দর্য ও রস, শিহরণ ও আনন্দানুভূতির মধ্য দিয়ে আমরা কাটালাম। কিন্তু গণিতে অনুশীলনের বিশেষ দরকার। অঙ্ক কেবল বুঝলেই হয় না,—অনুশীলন করতেও হয়। তা না হলে পরীক্ষায় ভুল হবার সম্ভাবনা বেশী। তাই কয়েকটিমাত্র অঙ্ক দিলাম ; তোমরা বাড়ীতে কষবে, অবশ্য তোমাদের পাঠ্য-পুস্তকের অঙ্ক নিয়েও চেষ্টা করবে।

(1) $2x^2+9x+4$ এবং $2x^2-3x+2$;

(2) $3x^2-13x+12$ এবং $x^2+2x-15$;

(3) x^3-7x+6 এবং x^3-3x^2+4 ;

(4) x^3+x^2+x+1 এবং x^3+3x^2+3x+1

(5) $6x^2+xy-15y^2$ এবং $21x^2+41xy+10y^2$

বিজ্ঞানের টুকরো খবর

বেঁটেদের দুঃখ ঘুচল

লম্বা আর বেঁটে এই দুধরনের উচ্চতার মানুষ আমরা দেখতে পাই। যাঁরা বেঁটে,তাদের এই আকৃতির জন্যে দুঃখের শেষ নেই। এরা সবাই লম্বা হতে চান, কিন্তু লম্বা তো আর এমনি এমনি হওয়া যায় না—প্রত্যেক মানুষের উচ্চতা বৃদ্ধি ঘটায় এক বিশেষ ধরনের হরমোন। এই হরমোন পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসৃত হয়। এই লম্বা হওয়ার হরমোন, বেঁটেদের শরীরে প্রবেশ করালে কি তার বৃদ্ধি সম্ভব? কিন্তু এই কৃত্রিম হরমোন তৈরী করা খুব খরচ সাধ্য। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা 'এস্‌চেরিয়া কোলি' নামে এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা এই উচ্চতা বৃদ্ধিজ হরমোন তৈরী করতে সম্ভব। মানষের দেহের প্রত্যেকটি গুণই জীন দ্বারা সুপরিকল্পিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত। ১৯৭৯ সালে যে জীন উচ্চতা বৃদ্ধি করবে তা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানো হল আর তারও নাম দেওয়া হল, 'ই. কোলি'। এর পরবর্তী কাজ হল দেখা, এই নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া উচ্চতা বৃদ্ধিজ হরমোন তৈরী করবে না অন্য কিছু। কিন্তু, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এই ব্যাকটিরিয়াগুলো যে হরমোন তৈরী করছে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর গুণাবলী প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরী হরমোন-এর মতো। ইঁদুরের ক্ষেত্রে পিটুইটারী থেকে নিঃসৃত প্রাকৃতিক হরমোনের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটে।

আবর্জনা থেকে কৃষিসার

আমেরিকার ইঞ্জিনীয়াররা মৃত সাগরের জলগ্যাস, বহনকারী আবর্জনা, বালির ঝড় আর সাগর সৈকতে খুব গভীরভাবে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন, কোথাও থেকে কৃষিসার পাওয়া যাবে কি'না? এই আবর্জনা ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের কথা চিন্তা করে, আতঙ্কের বিষয়বস্তু হলেও, বর্তমানে এর থেকে শক্তি ও খাদ্যের সার তৈরীতে কাজে লাগানো হচ্ছে। সমুদ্রের পাড়ের ধাতব আবর্জনা আর বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য আবর্জনা জলে মিশ্রিত থাকলেও—এটা সৌরশক্তির একটা উৎস আর এর থেকে পটাশ ও নুন মেশানো পদার্থও পাওয়া যায়। সাগরের জল বিরাট জায়গা জুড়ে বহু সময় ধরে জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে উৎপন্ন যে সাদা পদার্থ, তাই তো পটাশ লবণ। বর্তমানে মৃত সাগরের উত্তর দিকে ২৫,০০০ একর জমির উপর প্রায় ৪০ বর্গমাইলের সমান একটা খাল খনন করা হয়েছে, যার থেকে পটাশ লবণ পাওয়া যাবে।

ধূমকেতু

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূমকেতুর কথা তোমরা সকলেই জানো, অন্ততঃ শুনেছ। কিন্তু অনেকেই একে চোখে দেখোনি। দেখবে কি করে বলো? আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব তো বড় সচরাচর হয় না। অনেক অনেক বছর অন্তর নেহাতই আকস্মিক ভাবে আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়। তাই ধূমকেতু যখন প্রথম দেখতে পাওয়া যায়, তখন মানুষের মনে এক ধরনের ভয় জাগে। মধ্য গগনে একেবারে অনাহূত অতিথির মতো অত বড় একটা বিরাট ধূম্র পদার্থ উড়ে এসে জুড়ে বসলে মনে হয়—বুঝি বা এর অশুভ প্রভাবে পৃথিবীর কোনো অকল্যাণ ঘটে। যে জিনিসটা জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে সবচেয়ে অপরিচিত, দূরাগত, ভিন্নরূপ আর কালে-ভদ্রে দেখা দেয় তাকে আমরা তেমন খুশী মনে গ্রহণ করতে পারি না। তাই অমঙ্গলের চিহ্ন-রূপে ধূমকেতু সম্বন্ধে মানুষের ভয়মিশ্রিত আদিম মনোভাব ও সংস্কার আজও অনেক দেশে টিঁকে আছে।

সৌর জগৎ এক বিচিত্র সৃষ্টি। আকাশমার্গের অধিপতি সূর্য একটা বিশাল রাজ্য কেমন সুন্দর শৃঙ্খলার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। কত গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে যে যার নিজ কক্ষপথে চলাফেরা করছে। কোথাও ব্যতিক্রম নেই, বিশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু কখনো কখনো এই সুনিয়মের রাজ্যেও উৎপাত দেখা যায়, এক একটা বিভীষিকা এসে হাজির হয়। ধূমকেতু হচ্ছে এই রকমের একটা সৌর-কাব্যের ছন্দঃপতন। সারা আকাশ জুড়ে হঠাৎ চমক লাগিয়ে বিস্ময় জাগিয়ে একদিন উদয় হয়। প্রকাণ্ড তার পুচ্ছ—মস্ত বড় একটা ঝাঁটার মতো দেখতে।

এই লেজটি কিন্তু কখনো সূর্যের দিকে ছড়িয়ে থাকে না, তার উলটো দিকেই বিস্তৃত থাকে। কোনো কোনো ধূমকেতুর আবার একাধিক পুচ্ছ থাকে। আর এক একটি পুচ্ছ লম্বায় প্রায় দশ কোটি মাইল পর্যন্ত হতে পারে, ভাবলে অবাক্ হতে হয়। কিন্তু পুচ্ছটি যতই দীর্ঘ ও বিশাল হোক, ওজনে অত্যন্ত হালকা। কারণ, ধূমকেতুর সমস্ত শরীরটাই হল বাষ্প দিয়ে তৈরী। মুণ্ডটা অবশ্য আরও একটু ভারি। কিন্তু লেজটা যতই লম্বা হোক, বাতাসের চেয়েও সেটি হালকা।

ধূমকেতুর পুচ্ছটি সাধারণতঃ সূর্যের বিপরীত দিকেই থাকে। তবে যতই সূর্যের কাছে এসে পড়ে, ততই লেজটি একটু একটু করে বড় হয়ে যায়। এর কারণটা কি? কারণ এই যে, ধূমকেতু যখন সূর্য থেকে বেশ দূরে থাকে, তখন তার ভিতরে যে সব জড়পিণ্ড আছে, সেগুলি একেবারে নিশ্চল অবস্থায় থাকে। সূর্যের নিকটে এসে পড়লে তারই টানে এই জড়পিণ্ডগুলি রীতিমত চঞ্চল হয়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি সুরু হয়ে যায়। ফলে ধূমকেতুর দেহের কতক অংশ বেশ গরম হয়ে উঠে ঘন বাষ্পের সৃষ্টি করে। সেই বাষ্পই হল ধূমকেতুর লেজ। সূর্যের কাছ থেকে ধূমকেতু যখন আবার সরে আসতে আরম্ভ করে, তখন ঐ ভিতরকার জড়পিণ্ডগুলি আর ঠোকাঠুকি করে না। নিশ্চল হয়ে আসে, নতুন করে বাষ্প আর জন্মায় না। পুচ্ছটিও তাই ক্রমশঃ ক্ষয়ে যায়, ছোট হয়ে আসে।

ধূমকেতুর লেজটি যে কেন সর্বদাই সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে আর মাথাটা হয় সূর্যমুখী, এ প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা এসে পড়ে। তবে সংক্ষেপে বলা চলে যে, ধূমকেতুর শরীর থেকে যে বাষ্প নির্গত হয়, সেটা স্বভাবতই সূর্যের দিকে যেতে চায়। কিন্তু তা চাইলে হবে কি? সূর্য তাকে কাছে আসতেই দেবে না, জোর করে বাধা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেবে। সুতরাং এতখানি জমাট বাষ্প আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে অবশেষে সূর্যের উল্টো দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। ঝাঁটার মতো ছড়িয়ে পড়া এই বাষ্প-রাশিকেই আমরা ধূমকেতুর পুচ্ছ বলে থাকি।

ধূমকেতুর আকৃতির কথা এতক্ষণ বলেছি। এইবার তার প্রকৃতির একটু পরিচয় দেওয়া যাক। আকাশে আছে হাজার হাজার তারা, সূর্যের মতো কিংবা সূর্যের চেয়েও অনেক বড়। তাদের চারপাশে আছে অজস্র গ্রহ-উপগ্রহ। নয়টি গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহ নিয়ে যে সূর্য আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরিচিত, তা ঐ অসংখ্য নক্ষত্রদের মধ্যে সামান্য একটি। এই সূর্যের রাজ্যেও ক্বচিৎ দু'একটা অদ্ভুত পদার্থ নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এসে হাজির হয়। এরা সূর্য-জগতের কেউ নয়। আকাশের এখানে-সেখানে দল-ছুট হয়ে ঘুরে বেড়ায়—যেন অন্ধকার থেকে ছিট্‌কে আসা কোনো অজানা ভ্রান্ত ভ্রাম্যমাণ পথিক। সূর্য ও নক্ষত্রদের মতো তাদের নিজস্ব আলো নেই। সৌর জগতের এলাকায় ঢোকা মাত্রই সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে তারা একটা সুস্পষ্ট আকার নেয়। যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখনই তারা ধূমকেতু।

এই ধূমকেতুর সঙ্গে সূর্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে পথ ভুলে চামচিকের মতো একবার যদি এরা সূর্যের ঘরে

ঢুকে পড়ে, তাহলে ছাড়া পাওয়া মুস্কিল। অন্ততঃ এক পাক ঘুরতে হবে। সূর্যের আকর্ষণী শক্তিকে কাটিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেবার মতো সামর্থ্য এদের নেই। তাই সূর্যের টানে ছুটে এসে সূর্যের দিকেই এগিয়ে চলে। আর খুব তাড়াতাড়ি মাত্র একবার সূর্য-প্রদক্ষিণ সেরে আবার চলে যায় বাহির বিশ্বের অজানা অন্ধকার অনন্ত পথে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই খুব ছোট, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায় না। যদি কখনো কোনো বড় আকারের ধূমকেতু আকাশে এসে পড়ে, তবেই আমরা খালি চোখে সেটি দেখতে পাই।

তাই থেকে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, আন্দাজ ১৭৫৭ সালে ঐ ধূমকেতুকে আবার দেখা যাবে। সত্যই ঘটেছিল তাই। সকলে অবাক্ হয়ে দেখল, ১৭৫৭ সালে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সেই বিরাট ধূমকেতু আকাশে উদয় হল। হেলি সাহেব গণনা করে দেখেছিলেন যে, আন্দাজ পঁচাত্তর বছর অন্তর এই ধূমকেতু সূর্যকে একবার করে ঘুরে আসে। ১৮৩৫ এবং ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে এই ধূমকেতুই আবার এসে হাজির হল এবং আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জায়গা জুড়ে রইল কয়েক দিন। ১৯১০ সালেই ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড-

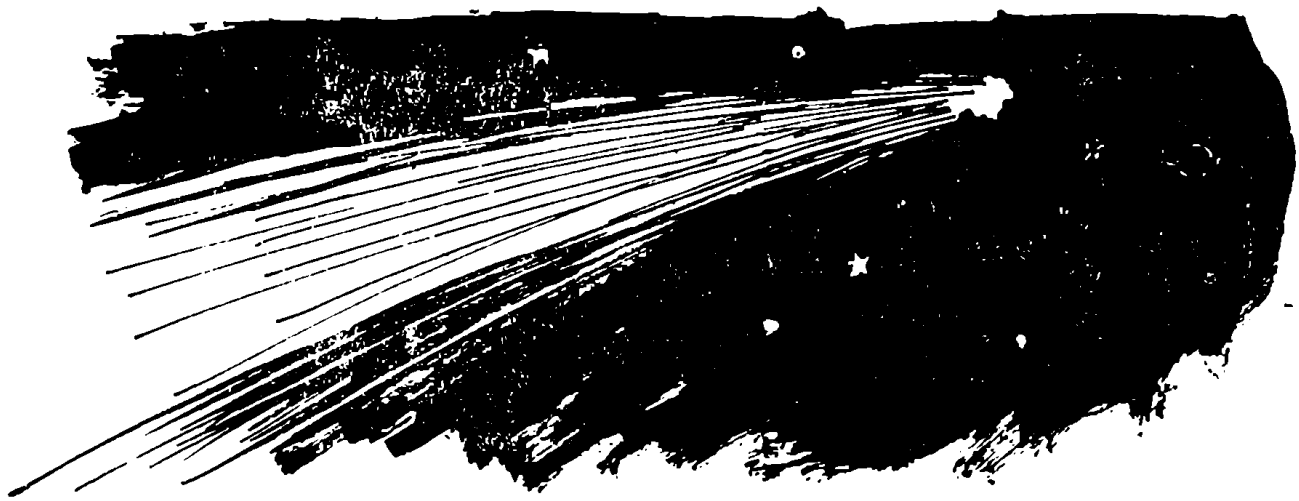

সূর্যের গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়, একা বৃহস্পতির কাছেই বন্দী হয়েছে গোটা ষোল ধূমকেতু। শনির কাছে দু'টি, ইউরেনাসের কাছে তিনটি আর নেপচ্যুনের কাছে ছ'টি। এই সব বন্দী ধূমকেতু শুধু যে আটকে পড়ে থাকে তা নয়, গ্রহনক্ষত্রের চারপাশে অবিরাম ঘুরতে থাকে। এই উপগ্রহগুলির 'অর্বিট' বা কক্ষপথ ইলিপ্‌স কিংবা প্যারাবোলার আকার নেয়।

ইংরেজি ১৯১০ সালে যে মস্ত বড় ধূমকেতুটিকে পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, সেটি 'হেলির' ধূমকেতু' নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হেলিসাহেব এই বিশাল ধূমকেতুটির গতিবিধি আবিষ্কার ও নির্ণয় করেন, তাই ঐ নাম। আগেকার পণ্ডিতরা ভাবতেন, ধূমকেতু একবার দেখা দিয়েই 'মহাকাশে' মিলিয়ে যায়। আর ফিরে আসে না, তাদের পথেরও কোনো নিশানা মেলে না। হেলি সাহেবের মতে, ধূমকেতু কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন জ্যোতিঃ-পদার্থ নয়, মানে একেবারে অপরিচিত, আগন্তুক নয়। ১৫৩৫ এবং ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দে একে দেখা গিয়েছিল এবং

এর মৃত্যু হলে সাধারণ মানুষ ধূমকেতুর আবির্ভাবকে অশুভ ইঙ্গিত বলে ভাবল। এটা অবশ্য ভুল ধারণা।

হেলি সাহেবের গণনা যখন তিন তিন বার মোটামুটি মিলে গেছে, তখন ১৯৮৫ সালে কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে ঐ প্রসিদ্ধ ধূমকেতু আবার দেখা যাবে, যদি ইতিমধ্যে কোনো অঘটন না ঘটে থাকে অর্থাৎ সূর্যের আকর্ষণী শক্তি কমে না গিয়ে থাকে। আর মাত্র কয়েক বছর বাকি, অপেক্ষা করে থাকো। তখন বিশাল পুচ্ছ নিয়ে ঐ প্রকাণ্ড ধূমকেতু সারাটা আকাশ জুড়ে কয়েক দিন বিরাজ করবে। আর পৃথিবীর নানা দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করার জন্য তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং অনেক ছবি তুলে রাখবেন। ইতিমধ্যে অবশ্য পৃথিবীর কয়েক জায়গা থেকে কয়েকটি ধূমকেতু দেখা গেছে। তবে বিপুলকায় 'হেলির ধূমকেতুর' কাছে এগুলি ছানা-পোনা।

১৭/১ ব্রড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯

পড়াশোনা

রসায়নের সহজপাঠ

অমরনাথ রায়

জৈব রসায়নের অ-আ-ক-খ

রসায়ন বিজ্ঞান প্রধানত তিনটি শাখায় বিভক্ত—ভৌত রসায়ন, অজৈব রসায়ন আর জৈব রসায়ন। রসায়ন বিজ্ঞানের এই শেষোক্ত শাখা অর্থাৎ 'জৈব রসায়ন' দিয়ে এই অধ্যায় শুরু করা যাক্।

'জৈব' শব্দটি এসেছে 'জীব' থেকে। আগেকার দিনের বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, জৈব যৌগ সৃষ্টির মূলে আছে এমন এক সঞ্জীবনী শক্তি, যা কেবলমাত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবিত কোষেই থাকে। আর এই অজ্ঞাত প্রাণশক্তি ব্যতিরেকে জৈব যৌগ সৃষ্টি হতে পারে না। এ ধারণা প্রচলিত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

এই ধারণার সূত্র ধরে বলা হতো যে প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহজাত যৌগ মাত্রই জৈব যৌগ এবং জৈব রসায়ন শাস্ত্রে এই সব যৌগেরই রাসায়নিক পর্যালোচনা করা হয়।

মানুষের জীবনে জৈব যৌগের অবদান অপরিসীম। আদিকাল হতে মানুষ খাদ্য ও পানীয়রূপে চাল, গম, তেল, ঘি, মাখন, চিনি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মদ ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে। পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুতির জন্যে ব্যবহার করে আসছে তুলা, রেশম ও পশম। লেখাপড়ার জন্যে ব্যবহার করছে কাগজ ও কালি। রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্যে কত রকমের ওষুধই যে না ব্যবহার করছে তার ইয়ত্তা নেই। আজকের দিনের সভ্য মানুষের স্নো, ক্রীম, নানা-রকম সুগন্ধি ও এমনি অনেক প্রসাধন সামগ্রী না হ'লে চলে না। জ্বালানির জন্যে মানুষ ব্যবহার করে কাঠ, কয়লা, কেরোসিন, স্পিরিট, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও রান্নার গ্যাস। কৃষির উন্নতির জন্যে কত রকমের কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ও রাসায়নিক সার মানুষকে ব্যবহার করতে হয়। বস্ত্রকে রঞ্জিত করার জন্যে রকমারি কৃত্রিম রঙ মানুষ তৈরি ক'রে নেয়। ডিনামাইট, ট্রাই নাইট্রো টলুই বা সংক্ষেপে টি. এন টি, পিক্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থগুলিকে মানুষ একাধারে সমরাস্ত্র এবং অপরদিকে জনহিতকর কাজে নিয়োজিত করে। মানুষের দেহের পুষ্টির জন্যে প্রয়োজন হয় হরেক রকম ভিটামিনের। অ্যাড্রেন্যালিন,, থাইরক্সিন, ইনসুলিন ও এমনি অনেক হরমোন মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের সুসমঞ্জস বৃদ্ধি এবং বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। কৃত্রিম রবার্ প্লাস্টিক, নাইলন, টেরিলিন ও পলিথিনের অজস্র শিল্পদ্রব্য আজ মানুষের নিত্য প্রয়োজন মেটায়।—এ সব জিনিসই জৈব রসায়নের অবদান, এরা সবাই জৈব যৌগ। তার মানে, পূর্ববর্তী সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ দেহ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই যৌগগুলিকে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও বিবর্তন ঘটছে। এককালে যা ছিল সত্য, আজ তা হয়তো আংশিক সত্যে কিংবা ভুল বলে পরিগণিত হয়েছে! এইটাই তো গতিশীলতার লক্ষণ! রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জৈব যৌগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে ধারণা ছিল, এখন তা পরিবর্তিত হয়েছে। আজকাল জৈব যৌগ বলতে আমরা বুঝি কার্বনঘটিত যৌগগুলিকে, এবং তাদের রাসায়নিক আলোচনা করা হয় যে শাস্ত্রে, তাকে আমরা বলে থাকি 'জৈব রসায়ন শাস্ত্র'। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—কার্বনেট, বাই কার্বনেট, কার্বন মনক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি যৌগগুলিও তো কার্বন ঘটিত যৌগ। তবে কি এরাও জৈব যৌগের পর্যায়ে পড়বে?—এর উত্তর হবে 'না', কারণ এদের উৎস প্রধানত জড় বস্তু। জড় বস্তু যে সব যৌগের উৎস, তারা হলো অজৈব যৌগ।

জৈব যৌগের গঠন রহস্য সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের যে বিশ্বাস ছিল, তার মূলে কুঠারাঘাত করেন এক জার্মান রসায়নবিদ্, নাম তাঁর 'ফ্রেডারিক ভোহ্লার'।

1828 সাল। ফ্রেডারিক ভোহ্লার তখন আটাশ বছরের যুবক। তখনকার দিনের রসায়ন বিজ্ঞানীদের মত ভোহ্লারও জানতেন যে জৈব উৎস অথবা উদ্ভিদের জীবিত কোষ থেকে পাওয়া যায় বলে মাখন, চিনি, গ্লুকোজ, মদ, বিভিন্ন আমিনো অ্যাসিড, ভিটামিন, হরমোন, এনজাইম উৎসেচক ইত্যাদি জৈব যৌগ শ্রেণীভুক্ত। আবার খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড, কাপড় কাচার সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট কষ্টিক সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, তুঁতে বা কপার সালফেট ইত্যাদি অজৈব যৌগ, কারণ একাধিক জড় বা নির্জীব পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগের ফলে এদের উৎপত্তি হয়। সেকালের

বিজ্ঞানীরা তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, অদূর ভবিষ্যতে অজৈব যৌগের মত জৈব যৌগও একদিন পরীক্ষাগারে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। আর সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করবেন এক তরুণ জার্মান রসায়নবিদ্।

ফ্রেডারিক ভোহ্লার

হ্যাঁ, ফ্রেডারিক ভোহ্লারই সেই তরুণ রসায়ন বিজ্ঞানী। 'অ্যামোনিয়াম সায়ানেট' একটা অজৈব যৌগ। তাই নিয়ে গবেষণা করছিলেন ভোহ্লার। গবেষণাকালে একদিন তিনি আকস্মিকভাবে সাদা রঙের একটি যৌগের কতকগুলি সূচাকৃতি কেলাস পেয়ে গেলেন। ভোহ্লারের পর্যবেক্ষণ আর স্মৃতিশক্তি—দুই-ই ছিল অতি প্রখর। তখনই তাঁর মনে পড়ে গেল নিজের ছাত্রাবস্থার কথা। কলেজে পড়ার সময় প্রাণীর মূত্র থেকে একবার তিনি ইউরিয়ার কেলাস তৈরি করেছিলেন। 'ইউরিয়া' একটি জৈব যৌগ, জমির পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার।

যাই হোক, ইউরিয়ার কেলাসের সঙ্গে সদ্য আবিষ্কৃত এই কেলাসগুলির অদ্ভুত মিল লক্ষ্য ক'রে ভোহ্লারের মনে হলো—এই কেলাসগুলি ইউরিয়ার কেলাস নয় তো?—তাই বা হয় কি ক'রে? ইউরিয়া তো জৈব যৌগ। অজৈব উৎস থেকে জৈব পদার্থ উৎপন্ন হবে কি ক'রে? তবুও ভোহ্লারের সন্দিগ্ধ মন শান্ত হলো না। সদ্য আবিষ্কৃত কেলাসগুলির গঠন ও ধর্ম নিরূপণের জন্যে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। অচিরেই তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে ঐ সাদা কেলাসগুলি ইউরিয়ার কেলাসই বটে। তাঁর অনুমানই সত্যি। তখন আনন্দে ও উত্তেজনায় শিহরিত হ'য়ে উঠলেন ভোহ্লার। অ্যামোনিয়াম সায়ানেট (NH_4CNO) নামক অজৈব যৌগের জলীয় দ্রবণকে উত্তপ্ত ক'রে আকস্মিকভাবে তিনি পেয়ে গেছেন জৈব যৌগ ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$]; রসায়নের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ক'রে ফেলেছেন নিজের অজান্তে।

1828 সালে ভোহ্লারের এই আকস্মিক আবিষ্কারের পর একে একে নিত্যনূতন জৈব যৌগ রসায়নাগারে সংশ্লেষণ করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। 1845 সালে কোল্বে (Kolbe) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ঘটিত জৈব যৌগ অ্যাসিটিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ করলেন। বার্থেলো (Berthelot) 1865 সালে মিথেন নামক জৈব যৌগ সংশ্লেষণ করলেন। এঁদের মত আরও অনেক রসায়ন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় একে একে সংশ্লেষিত হলো কৃত্রিম নীল রং, বহুমূত্র রোগের ওষুধ 'ইনসুলিন', নানারকম ভিটামিন, অ্যান্টিবায়োটিক ও হরমোন। এমনিভাবে আজ পর্যন্ত শত সহস্র সংশ্লেষিত জৈব যৌগ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এগুলি মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মানুষকে মারাত্মক সব ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে, আর সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছে দেশে-বিদেশে। এখন আর রঙের জন্যে নীলের চাষ করতে হয় না, সুগন্ধির জন্যে খুঁজে বেড়াতে হয় না লোধ্র ফুলের রেণু। সংশ্লেষিত জৈব যৌগগুলি এখন এ সবের অভাব মেটাচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদে নিত্যনূতন কৃত্রিম জৈব যৌগ উৎপাদন ক'রে মানুষ তার প্রকৃতি নির্ভরতাকে কমাচ্ছে।

জৈব যৌগের বৈশিষ্ট্য—অজৈব যৌগের সঙ্গে এর পার্থক্য

1. সকল জৈব যৌগের মূল উপাদান হলো কার্বন। কার্বন থাকার দরুন এই যৌগগুলি দাহ্য এবং এদের দহনের ফলে প্রধানত কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়।

2. প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, হ্যালোজেন, সালফার, ফসফরাস, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি মৌলের সমবায়ে জৈব যৌগ গঠিত হয়। অপর পক্ষে অজৈব যৌগ বিরানব্বইটি স্থায়ী মৌলের প্রায় সব কটি দ্বারা গঠিত হয়। তবুও আজ পর্যন্ত দশলক্ষাধিক জৈব যৌগ আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু অজৈব যৌগের সংখ্যা সেই তুলনায় খুবই কম, মাত্র পঁচাত্তর হাজার।

3. জৈব যৌগে বহু সংখ্যক কার্বন পরমাণু নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে উচ্চ আণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন

অণু সৃষ্টি করতে পারে। অপরপক্ষে অজৈব যৌগের অণুর গঠন অপেক্ষাকৃত সরল। এবং এদের অণুতে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক পরমাণু থাকে। স্টার্চ জাতীয় এক ধরনের জৈব যৌগের আণবিক সংকেত হলো $C_{1200}H_{2000}O_{1000}$. অপরপক্ষে জল (H_2O), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) ইত্যাদি অজৈব যৌগের গঠন অপেক্ষাকৃত সরল।

4. আয়নে বিশ্লেষিত হয় না বলে জৈব যৌগগুলির রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি মন্থর। অপরপক্ষে অজৈব যৌগগুলি আয়নিত হয় বলে এদের রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি দ্রুততর।

5. জৈব যৌগের গলনাংক ও স্ফুটনাংক অপেক্ষাকৃত কম। অতিরিক্ত উত্তাপে এই যৌগগুলি বিযোজিত হয়। অপরপক্ষে অজৈব যৌগগুলি উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে এবং এদের গলনাংক ও স্ফুটনাংক, দুইই অপেক্ষাকৃত বেশী হয়।

6. একই জারক বা বিজারক দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন জৈব যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করতে পারে, কিন্তু অজৈব যৌগের ক্ষেত্রে সে রকমটি ঘটে না। অজৈব যৌগের ক্ষেত্রে এক প্রকার জারক বা বিজারক দ্রব্য একই প্রকার বিক্রিয়া ঘটায়।

7. প্রধানত সমযোজ্যতার দ্বারা জৈব যৌগের অণু গঠিত হয়। সেই কারণে জৈব যৌগ জলে সাধারণত অদ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। অপরপক্ষে অজৈব যৌগ সাধারণত তড়িৎ যোজ্যতা দ্বারা গঠিত হয় বলে জলে দ্রাব্য হয় এবং এদের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ পরিবাহী হয়; তার মানে অজৈব যৌগগুলির অধিকাংশ দ্রবণই তড়িৎ বিশ্লেষ্য হয়।

8. পরমাণু বিন্যাসের বিভিন্নতার জন্যে একই আণবিক সংকেতের সাহায্যে একাধিক জৈব যৌগকে বোঝানো যায়। যথা C_2H_6O আণবিক সংকেতটি ইথাইল অ্যালকোহলকে বোঝায়, আবার ডাই ইথাইল ইথারকেও বোঝায়। অপর পক্ষে একটি আণবিক সংকেত দ্বারা একটি মাত্র অজৈব যৌগকেই বোঝান যায়। HNO_3 লিখলে একটি মাত্র নাইট্রিক অ্যাসিড অণুকেই বোঝায়, অন্য কোন যৌগকে বোঝায় না।

9. ধর্মের সাদৃশ্য অনুযায়ী জৈব যৌগগুলিকে কয়েকটি সমগণীয় সারিতে (হোমোলগাস সিরিজ) বিভক্ত করা যায়। এক একটি সমগণীয় সারির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত যৌগের ধর্ম সদৃশ হয় এবং তাদের একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা বোঝান যায়। অপর পক্ষে অজৈব যৌগগুলির মধ্যে ধর্মের এই রকম সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের সমগণীয় সারিও হয় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন (C_3H_8), বিউটেন (C_4H_{10}) ইত্যাদি যৌগগুলি (যাদের সাধারণভাবে 'অ্যালকেন' বলা হয়) একই সমগণীয় শ্রেণীভুক্ত বলে সদৃশধর্মী এবং এদের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n+2}, যেখানে n একটি পূর্ণ সংখ্যা। মিথেনের ক্ষেত্রে n এর মান 1, ইথেনের ক্ষেত্রে 2, প্রোপেনের ক্ষেত্রে 3 এবং বিউটেনের ক্ষেত্রে 4 হয়।

10. জৈব যৌগের শ্রেণী নির্দেশ করে যৌগের অন্তর্গত কার্যকরী মূলক বা ফাংশনাল গ্রুপ; যথা মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH) যৌগে হাইড্রক্সিল কার্যকরী মূলকটির (OH) উপস্থিতি লক্ষ্য করেই বোঝা যায় যে এটি একটি অ্যালকোহল শ্রেণীভুক্ত যৌগ। অপরপক্ষে অজৈব যৌগে এই রকম কার্যকরী মূলক আদৌ থাকে না—থাকে কেবল সাধারণ অজৈব যৌগ মূলক বা 'কম্পাউণ্ড র‍্যাডিক্যাল'।

জৈব যৌগে কার্বনের যোজ্যতা:

জৈব, যৌগে কার্বনের যোজ্যতা 4, বিজ্ঞানী 'ভ্যান্ট হফ্' এবং 'লা বেল' 1874 খ্রীস্টাব্দে পৃথক পৃথক ভাবে কার্বনের যোজ্যতার চতুস্তলকীয় (tetrahedral) মতবাদ প্রচার করেন। এই বিজ্ঞানীদের মতবাদের মূল কথা

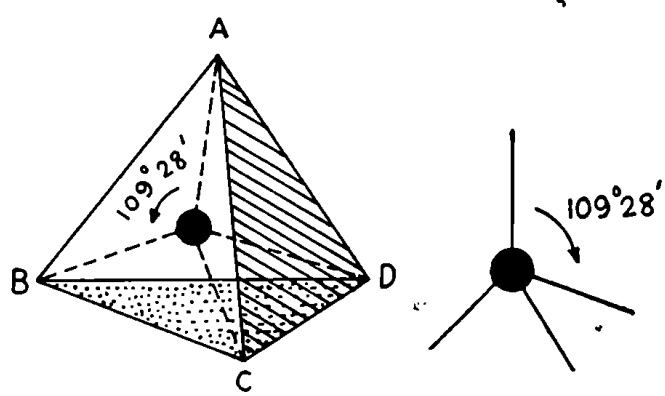

হলো এই যে, কার্বন পরমাণুর চারটি যোজ্যতা একই সমতলে থাকে না। একটি কাল্পনিক চতুস্তলকের (regular tetrahedran) কেন্দ্র বিন্দুতে কার্বন পরমাণু অবস্থান করে এবং কার্বন পরমাণুর চারটি যোজ্যতা চতুস্তলকের চারটি কোণের দিকে প্রসারিত থাকে। এ ভিন্ন কার্বন পরমাণুর যে কোন দুটি যোজ্যতার মধ্যবর্তী কোণের পরিমাপ 109°28′ (একশো নয় ডিগ্রী আটাশ মিনিট)।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জৈব যৌগের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন্ ধারণার প্রচলন ছিল ?

2. কোন্ রসায়নবিদ্ কোন্ আকস্মিক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, জৈব যৌগও অজৈব যৌগের মত পরীক্ষাগারে সংশ্লেষণ করা সম্ভব ?

3. জৈব যৌগ এবং জৈব রসায়ন শাস্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা কি ?

4. পাঁচটি জৈব এবং পাঁচটি অজৈব যৌগের নাম লেখ।

5. কৃষি বিজ্ঞানে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং মানুষের বিলাস সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এমন কয়েকটি জৈব যৌগের নাম লেখ।

6. পরীক্ষাগারে কে কবে 'অ্যাসিটিক অ্যাসিড' প্রথম সংশ্লেষণ করেন ?

7. কে কবে 'মিথেন' যৌগটিকে প্রথম সংশ্লেষণ করেন ?

8. মানুষের প্রকৃতি নির্ভরতাকে কমিয়েছে, এমন কয়েকটি জৈব যৌগের নাম লেখ।

9. জৈব যৌগের সঙ্গে অজৈব যৌগের পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।

10. জৈব যৌগ সাধারণত জলে অদ্রাব্য হয় কেন ?

11. কি কারণে একই আণবিক সংকেত দ্বারা একাধিক জৈব যৌগকে বোঝানো যায় ?

12. 'অ্যালকেন' কাদের বলে ? এদের সাধারণ সংকেত কি ?

13. জৈব যৌগে কার্বনের যোজ্যতা কতো ?

14. কোন্ কোন্ বিজ্ঞানী কার্বনের 'চতুস্তলকীয় মতবাদ' প্রচার করেন ? ঐ মতবাদে কি বলা হয়েছে ?

15. জৈব যৌগে কার্বন পরমাণুর যে কোনও দু'টি যোজ্যতা বণ্ডের মধ্যবর্তী কোণের পরিমাপ কতো ?

16. কার্বন মনক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ঘটিত যৌগ হওয়া সত্ত্বেও জৈব যৌগ নয় কেন ?

(ক্রমশঃ)

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত

রচনা প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় পর্যায়

মান : নবম ও দশম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার ৫০৲ দ্বিতীয় ৩০৲ তৃতীয় ২৫৲

বিষয়সূচী

ষষ্ঠ শ্রেণী : বিরল প্রাণী, শব্দ সংখ্যা ॥ ২৫০
সপ্তম শ্রেণী : ভৌগোলিক আবিষ্কার ॥ „ ৩০০
অষ্টম শ্রেণী : মহাকাশ গবেষণা ॥ শব্দ সংখ্যা ৪০০

নিয়মাবলী

[এক] মার্জিন সহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।

[দুই] নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

[তিন] প্রেরিত রচনার ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না ; পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ :—৩০শে জুন, ১৯৮২

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

প্রতিযোগীর নাম :.....বয়স.....
ঠিকানা :.....
বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা :.....
শ্রেণী.....রচনার বিষয়.....
প্রতিযোগীর স্বাক্ষর.....
প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর.....

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

বিরল প্রাণী ঃ লামা

বিবেক রায়

ভূগোল হইতে তোমরা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের কথা নিশ্চয়ই পড়েছ। মানচিত্রটা খুলে দেখ, এই মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পর্বতমালা রয়েছে। ঐ পর্বতমালার নাম 'আণ্ডিজ পর্বত-মালা'। আজ থেকে তিনশো বছরেরও কিছুকাল আগে স্পেনীয়রা যখন দক্ষিণ আমেরিকা অভিযান করে তখন তারা সেখানে কতকগুলি বৈচিত্র্যের সন্ধান পায়। তারা লক্ষ্য করে যে, সেখানকার অধিবাসীদের চেহারা ইউরোপীয়দের মত নয়। সে দেশে ঘোড়া, ভেড়া বা ঐ ধরনের কোন গৃহপালিত পশু নেই। স্থানীয় লোকেরা একটিমাত্র গবাদি পশুর সঙ্গেই পরিচিত এবং সেই পশুটির নাম 'লামা'।

আণ্ডিজ পর্বতমালার সুউচ্চ অঞ্চলগুলিতে এবং উচ্চ তৃণভূমিতে দু'রকমের তৃণভোজী প্রাণী বাস করে। এই প্রাণীদের চেহারা বড় বিচিত্র ধরনের। এদের চেহারায় উট এবং ভেড়ার আদল আছে। এই তৃণভোজী প্রাণীদের একটি হ'চ্ছে 'গুয়াঙ্কো' এবং অপরটি 'ভিকুনিনা'। 'লামা' গুয়াঙ্কোর বংশধর।

দক্ষিণ আমেরিকার মানুষেরা শত শত বছর আগে আণ্ডিজ পর্বতমালার ওপরে বড় বড় নগর নির্মাণ করেছিল। এই সব নগরে ছিল দুর্গ, কারুকার্যখচিত মন্দির ও প্রাসাদ। এত উঁচু পার্বত্য শিখরে এ রকম বিরাট-বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ সম্ভব হতো না, যদি না সে দেশে থাকতো 'লামা'।

মরুভূমিতে আরবরা যেমন উটের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীরা লামার ওপর নির্ভরশীল। লামা তাদের মাংস যোগায়, পশম যোগায়, দুধ যোগায় আর যোগায় চামড়া। উঁচু খাড় পর্বতে লামা তাদের ভার বয়ে নিয়ে যায়। উটকে যেমন বলা হয় মরুভূমির জাহাজ' তেমনি লামাকেও বলা 'আণ্ডিজ পর্বতমালার জাহাজ'।

লামারা যদিও উটের নিকট আত্মীয়, তবুও উটের সঙ্গে এদের চেহারার মিল দেখা যায়। যেমন ধর,—উটের পিঠে কুঁজ থাকে, এদের তা নেই। এরা সাধারণতঃ তিন থেকে চার ফুট উঁচু হয়। এদের পাগুলি বেশ লম্বা এবং লেজ ছোট। এদের সর্বাঙ্গ সাদা, ঈষৎ বাদামী বা কালো রঙের পশু লোমে ঢাকা। অনেক সময় সাদা লোমের ওপর কালো রঙের ফুট ফুট দাগ দেখা যায়। দেহের তুলনায় লামাদের মাথাটি ছোট, কিন্তু গলাটি বেশ লম্বা। ঝোলানো ভ্রূর নীচে বড় বড় চোখ দু'টি বড়ই সুন্দর দেখায়। এদের কান দু'টি বেশ লম্বা কিন্তু কানের আগা বাইরের দিকে বাঁকানো। কান দুলিয়ে এরা নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। উটেরই মতো এদের পায়ের গড়ন। পায়ের তলায় নরম মাংসল প্যাড থাকে। আর পায়ের নখগুলি ঈষৎ বাঁকানো এবং ধারালো হয়।

আণ্ডিজ পর্বতমালার আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথে সারি বেঁধে লামার দল হেঁটে চলে। পিঠে থাকে বোঝা। কখনও বা পাহাড়ের ওপরে তৃণভূমিতে পোষা লামার দলকে চরতে দেখা যায়। সন্ধেবেলায় রাখাল পোষা লামাগুলিকে আস্তানায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। অনেকটা সমতল জায়গা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে এদের আস্তানা বানানো হয়।

রাতে লামাদের আস্তানায় বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমতঃ, শত্রু প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়তঃ, এদের মল সংগ্রহ করা। ওদেশে কাঠের বড় অভাব। তাই লামার মল শুকিয়ে ঘুটের মত করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এক একটি লামা সাধারণতঃ সত্তর থেকে একশো পঁচিশ পাউণ্ড পর্যন্ত ভার বইতে পারে। এরা পিঠে ভার নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটে। সারাদিনে বড় জোর দশ কি পনের মাইল পথ যায়, কারণ পথে চরবার জন্যে মাঝে মাঝে থামে। এই গতিতে এরা এক নাগাড়ে কুড়ি দিন পর্যন্ত চলতে পারে। তিন-চার দিন জল পান না করে ভার বয়ে চলতে এদের কোন অসুবিধাই হয় না। আর পাহাড়ী আবহাওয়ায় এরা সহজে অসুস্থ হয়েও পড়ে না।

লামাকে দিয়ে তার ইচ্ছার অতিরিক্ত পরিশ্রম করানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদি লামা বুঝতে পারে যে তার পিঠে খুব বেশী মাল চাপানো হয়েছে, তাহলে ঐ মালের বোঝা না কমানো পর্যন্ত সে আর উঠতেই চাইবে না। এমনই গোঁয়ার প্রাণী যে, যা তারা করতে চায় না, জোর করে তা করানো যায় না। ভাল কথায় ভুলিয়ে এবং আদর করে ওদের দিয়ে কাজ আদায় করতে হয়। মারধর করলে ওরা বেঁকে বসে। আর একটি ব্যাপারে লামারা বড় একগুঁয়ে। একা একা ওরা কোন কাজ করতে চায় না। দলের আর সবাইয়েরও এক সঙ্গে কাজ করা চাই।

ভার বহনের কাজে পুরুষ লামাদের ব্যবহার করা হয়। দুধ আর পশম পাওয়ার জন্যে স্ত্রী-লামাদের আলাদাভাবে পালন করা হয়।

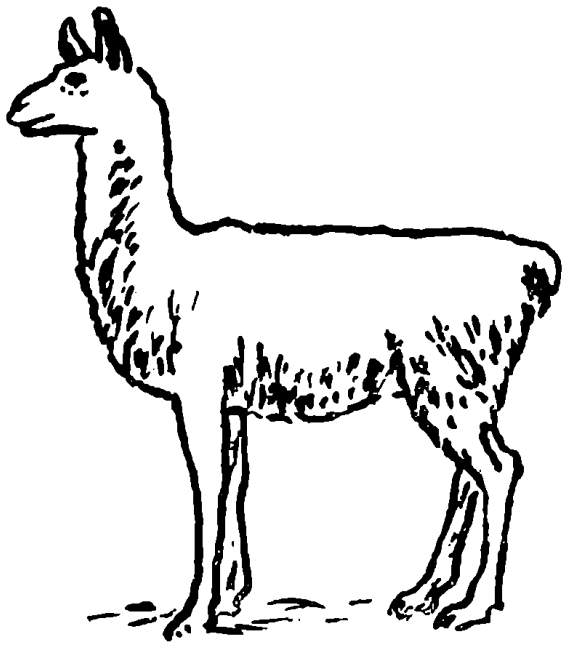

লামা

দক্ষিণ-আমেরিকার বাসিন্দারা এক বিশেষ ধরনের গরম জামা পরে। তার নাম 'পণ্ড'। একটি গরম চাদর, মাঝখানে তার একটি বড়ো ফুটো। ঐ ফুটো দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলেই 'পণ্ড' পরা হয়। 'পণ্ড' নামক গরম পোশাকটি তৈরি করা হয় লামার লোম দিয়ে বুনে।

লামা শাবকেরা দেখতে বড় সুন্দর হয়। এদের বৃদ্ধি হয় তাড়াতাড়ি। সাড়ে তিন বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত এদের দিয়ে ভার বহানো হয় না। এদের আয়ুষ্কালও বেশী নয়। বড় জোর কুড়ি বছর।

লামার প্রধান দুই শত্রু হচ্ছে 'পিউমা' এবং 'কণ্ডোর'। পিউমা হচ্ছে বাঘ এবং সিংহ জাতীয় প্রাণী এবং দেখতে অনেকটা সিংহীর মতো। এরা সুযোগ পেলেই লামাদের ঘাড় মটকে দেয়। আর 'কণ্ডোর' হ'চ্ছে শকুন জাতীয় বিরাটকায় পাখি। সুযোগ পেলেই এরা লামা-শাবকদের হত্যা করে।

লামাদের আত্মরক্ষার কৌশলটি বড় বিচিত্র। শত্রুকে এরা কামড়ায় না বা লাথিও মারে না। আক্রান্ত হলে অথবা বিরক্ত হলে এরা শত্রুর দিকে থুতু ছিটিয়ে দেয়। সেই থুতুর সঙ্গে অর্ধেক হজম হওয়া চেবানো খাদ্যও থাকে। —এ জিনিসটিতে বড় দুর্গন্ধ। আর এই দুর্গন্ধের ভয়েই লামাদের কেউ চটাতে চায় না।

এন্ বি/টি-৯৯এ, নিউ ট্রাফিক, পোঃ-ইন্দা (খড়্গপুর) জেলাঃ মেদিনীপুর, পিন্ কোড্ঃ-৭২১৩০৫

অঙ্কের মজার খেলা

জগদীশ চৌধুরী

তোমার কোন বন্ধুকে বল, সে যেন তোমাকে না দেখিয়ে কোন কাগজে তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা লেখে। তার পরে তাকে বল, সে যেন ঐ তিন অঙ্কের সংখ্যাটির পাশেই আবার ঐ একই সংখ্যাটিকে লেখে। তার মানে এবারে এইভাবে সে একটি ছয় অঙ্কের সংখ্যা পেল। এবার তাকে বল, ঐ ছয় অঙ্কের সংখ্যাকে সাত দিয়ে ভাগ করতে। বল—সবটাই ভাগ যাবে, ভাগশেষ কিছুই থাকবে না। সে তোমাকে না জানিয়ে না দেখিয়ে ভাগ করল এবং একটা ভাগফলও পেল। এবার তাকে বল, ঐ ভাগফলকে আবার এগারো দিয়ে ভাগ করতে। বল—এবারও সবটুকু ভাগ যাবে। তার পরে বন্ধু যে ভাগফল পেল, বল, তাকে আবার তেরো দিয়ে ভাগ করতে, এবং তাহলেই সে পেয়ে যাবে তার প্রথম তিন অঙ্কের সংখ্যাটি ভাগফল হিসাবে। সে সত্যিই তাই পাবে এবং একটু অবাকও হবে।

একটা উদাহরণ নাও। মনে কর বন্ধু ভাবল 791—দুবার পাশাপাশি লিখলে হল ঃ 791791 এবং একে 7 দিয়ে ভাগ করে সে পাবে 113113, তাকে 11 দিয়ে ভাগ করে 10283 এবং তাকে আবার 13 দিয়ে ভাগ করে-- 791।

এমনি ভাবে তিন অঙ্কের যেমন ইচ্ছা সংখ্যা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ। তারপরে বন্ধুকে তাক লাগাও। কেমন?

ডেপুটি ওয়েলফেয়ার কমিশনার, ডব্লু, বি, এল, ডব্লু বি ৬, চার্চ লেন, কলিকাতা।

সমতল তলে

আলোকের প্রতিফলন

(প্রথম পর্ব)

ডঃ অলক চক্রবর্তী

পড়ার বইতে আমরা আলোর প্রতিফলন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু কিছু পড়েছি। আলো যখন বায়ু অথবা অন্য কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারা বাধা পায় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতল থেকে মূল আলোকের বেশ কিছু অংশ আগের মাধ্যমে ফিরে আসে। একেই আলোকের প্রতিফলন বলে।

আপতিত আলোকের কি পরিমাণ অংশ পূর্ব মাধ্যমে ফিরে আসবে অর্থাৎ প্রতিফলিত হবে সেটা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন :

(১) আপতিত আলোক প্রতিফলকের উপর কত কোণে আপতিত হচ্ছে অর্থাৎ আপতন কোণের মান। এই কোণ যত বড় হবে তত বেশী পরিমাণ আলোকের প্রতিফলন হয়। (২) প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রকৃতির উপর প্রতিফলনের মান নির্ভর করে। বায়ু থেকে কাচে আপতিত হলে যে পরিমাণ আলোকের প্রতিফলন হবে, বায়ু থেকে জলে আপতিত হলে প্রতিফলনের পরিমাণ ভিন্ন হবে।

কোন কালো তলে আলোক আপতিত হলে আলোকের প্রায় কিছুই ঐ তল থেকে প্রতিফলিত হবে না, কিন্তু সাদা তলে আপতিত আলোকের প্রায় সবটাই প্রতিফলিত হয়।

আলোক কিরণ যখন কোন মসৃণ সমতলে (যেমন আয়না) পড়ে তখন প্রতিফলন দুটি নিয়ম মেনে চলে। সেইজন্য ঐ প্রতিফলনকে নিয়মিত প্রতিফলন বলে।

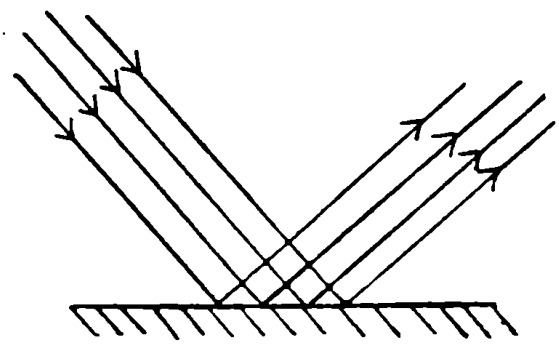

চিত্র—১

১নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছি কয়েকটি সমান্তরাল আলোক রশ্মি একটা মসৃণ তলে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর নিজেদের সাপেক্ষে সমান্তরাল অবস্থায় বেরিয়ে আসছে। এটাই নিয়মিত প্রতিফলন।

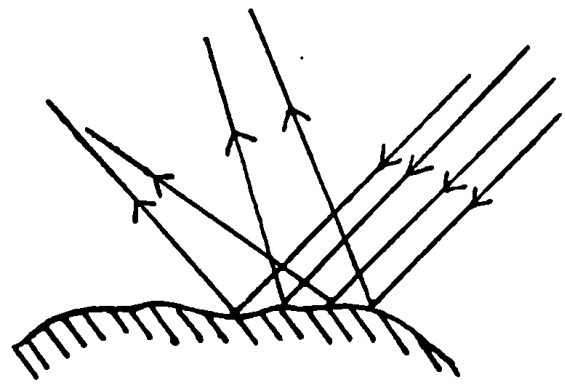

চিত্র—২

কিন্তু ২নং ছবিতে দেখছি সমান্তরাল আলোকগুচ্ছ অমসৃণ তলে প্রতিফলনের পর নিজেদের সাপেক্ষে আর সমান্তরাল থাকছে না। তাই এই প্রতিফলন বিক্ষিপ্ত বা অনিয়মিত। অনিয়মিত প্রতিফলন কতটা হবে, সেটা আলোর রং, প্রতিফলক তলের (অর্থাৎ যে তল থেকে প্রতিফলন হচ্ছে) উপাদান, এবং তলের বক্রতার ওপর নির্ভর করে।

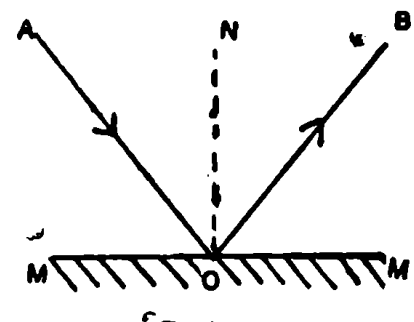

চিত্র—৩

৩নং ছবিতে আমরা দেখছি MM' একটা প্রতিফলক। AO হচ্ছে আপতিত রশ্মি। প্রতিফলক তলে-

এই রশ্মি O বিন্দুতে এসে পড়ছে বলে, O বিন্দুকে আপতন বিন্দু বলে। OB হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি। O বিন্দুতে MM′ এর ওপর আঁকা ON লম্বের নাম অভিলম্ব। ∠AON কে আপতন কোণ বলে। এবং ∠BON কে প্রতিফলন কোণ বলে।

আগেই বলা হয়েছে যে নিয়মিত প্রতিফলন দুটি সূত্রের অধীন। সূত্র দুটি হচ্ছে—

প্রথম সূত্র ঃ আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের ওপর আঁকা অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান হয়। সাধারণ আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমরা নিজেদের দেখতে পাই। আয়নার পেছনে আমরা নিজেদের যে প্রতিরূপ দেখি তাকে প্রতিবিম্ব বলা হয়।

কোন বিন্দু থেকে অপসারী আলোক কিরণ যখন প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে অন্য আরেক বিন্দুতে মিলিত হয় বা অন্য কোন বিন্দু থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয় তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলে।

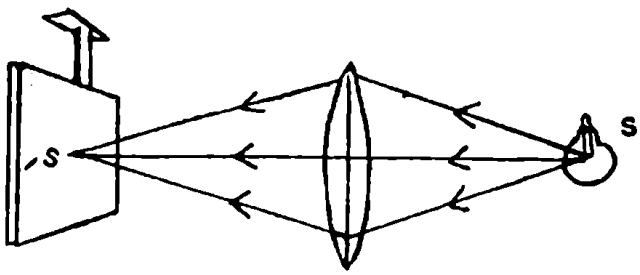

চিত্র—৪

আলোক কিরণ যথার্থ কোন বিন্দুতে মিলিত হলে আমরা প্রতিবিম্বকে সদ্‌বিম্ব বলি [৪ নং ছবি] আর যখন অন্য বিন্দুটির থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয় তখন বিন্দুটিকে অসদ্‌বিম্ব বলি [৫ নং ছবি]। আলোক বিন্দু সমতল আয়না থেকে যত দূরে অবস্থিত, প্রতিবিম্বও আয়নার পেছনে ঐ বিন্দু থেকে আয়নার উপর আঁকা অভিলম্বের উপর ঠিক ততখানি দূরে থাকবে।

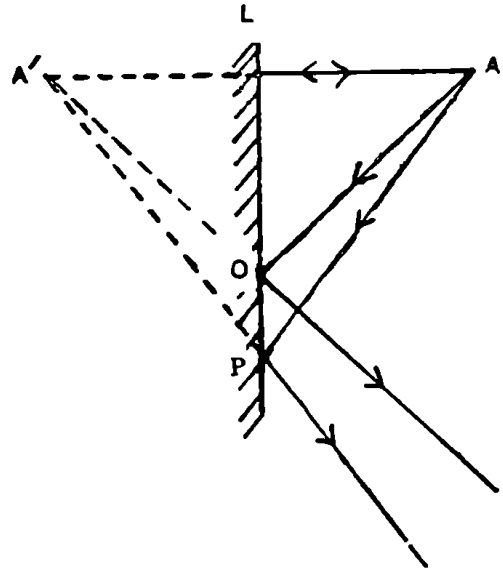

চিত্র—৬

৬নং ছবিতে আমরা দেখছি A একটি উৎস। A বিন্দু থেকে AO এবং AP রশ্মিদ্বয় LM আয়নার উপর পড়ল এবং প্রতিফলিত হল। ছবিটি থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, A′ বিন্দু হচ্ছে A বিন্দুর অসদ্‌ প্রতিবিম্ব অর্থাৎ A′ বিন্দু থেকেই আলোক ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হবে। জ্যামিতির সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায় AT = A′T এবং ∠ATO হচ্ছে এক সমকোণ অর্থাৎ 90°। সমতল আয়নায় প্রতিবিম্বের উচ্চতা বস্তুর উচ্চতার সমান হয়।

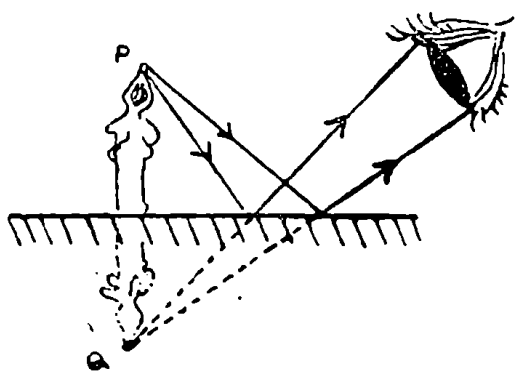

চিত্র—৫

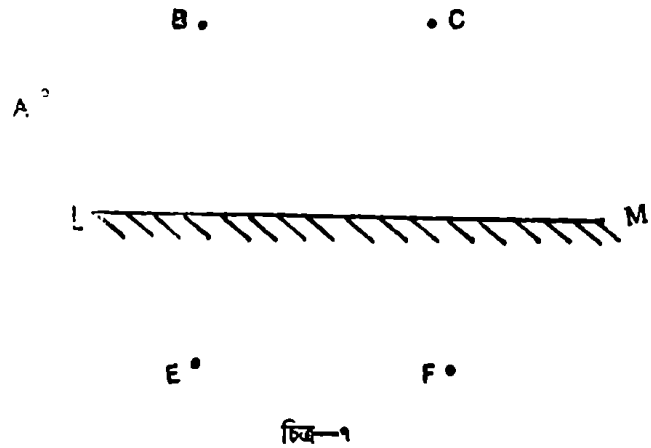

চিত্র—৭

সমতল আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখার দুটি শর্ত আছে। **প্রথম শর্তটি হচ্ছে :** বস্তুটিকে আয়নার সামনে থাকতে হবে। ৭নং ছবিতে LM একটি সমতল আয়না। এর সামনে A, B, C, D যে কোন অবস্থানে বস্তু থাকলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে কিন্তু আয়নার পেছনে E, F, ইত্যাদি বিন্দুতে বস্তু থাকলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে না।

প্রতিবিম্ব দেখার দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে চোখ এবং প্রতিবিম্ব সংযোগকারী রেখাটি আয়নাকে ছেদ করতে

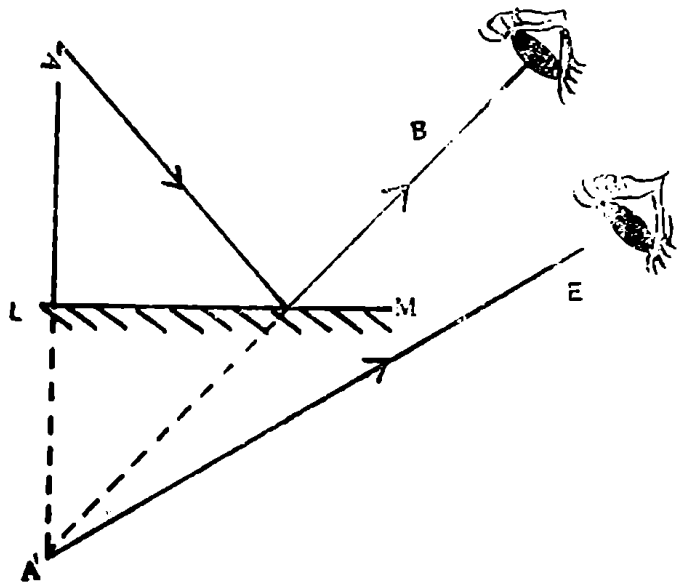

চিত্র—৮

হবে। ৮নং ছবিতে আমরা দেখছি B অবস্থানে চোখ থাকলে A'B রেখা আয়নাটিকে O বিন্দুতে ছেদ করছে। A' হচ্ছে A' বিন্দুর প্রতিবিম্ব আর LM হচ্ছে আয়না। কিন্তু E অবস্থানে চোখ থাকলে A'E রেখা আয়নাকে ছেদ করছে না তাই প্রতিফলনের কোন প্রশ্নই নেই এবং প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না। সমতল আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমাদের ডান হাতের প্রতিবিম্ব বাঁ হাত বলে মনে হয়। একে পার্শ্বীয় প্রতিফলন বলে। কোন প্রতিসম বস্তুর ক্ষেত্রে পার্শ্বীয় পরিবর্তন বোঝা যায় না। আমাদের নানারকম খটোমটো আলোচনা হল। আর এই সব আলোচনা থেকে আয়নার প্রতিফলন সম্বন্ধে নিচে লেখা খবর সংগ্রহ করা হল।

১। আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলনের উপর আঁকা অভিলম্ব একই সমতলে থাকবে।

২। আপতন কোণ প্রতিফলন কোণ সমান।

৩। আয়না থেকে বস্তুর দূরত্ব যত, আয়না থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব তত।

৪। প্রতিবিম্ব অসদ্।

৫। বস্তু ও প্রতিবিম্ব যে সরলরেখায় আছে, সেটি আয়নাকে লম্বভাবে ছেদ করে।

৬। সমতল আয়নায় প্রতিবিম্বের মাপ বস্তুর মাপের চেয়ে বড়ো বা ছোট হয় না, সমান থাকে।

৭। সমতল আয়নায় পার্শ্বীয় প্রতিফলন দেখা যায়।

আচ্ছা এইবার কয়েকটি প্রশ্ন আর তার উত্তর আলোচনা করা যাক।

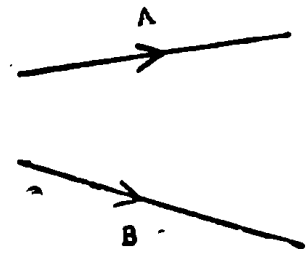

চিত্র—৯

প্রথম প্রশ্ন : দুজন শিকারী একটা হরিণের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে আছে। ৯নং ছবিতে A আর B বন্দুকের লক্ষ্যের দিক বোঝাচ্ছে। হরিণটা কোথায়?

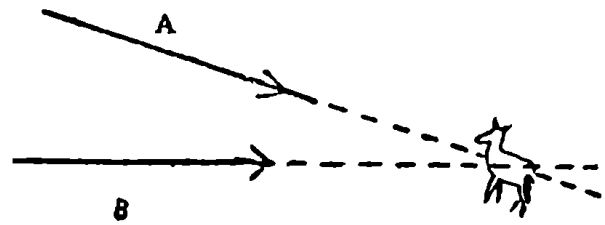

চিত্র—১০

১০নং ছবিতে এর উত্তর পাওয়া যাবে। স্বভাবতঃই রেখাদুটি যেখানে ছেদ করবে সেখানেই হরিণটি আছে।

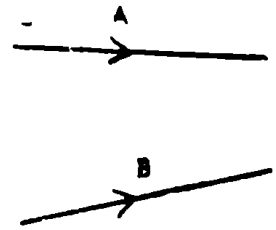

চিত্র—১১

আচ্ছা, যদি শিকারীদের বন্দুকের অভিমুখ ১১ নং ছবির মতো হত তাহলে তোমার কি সিদ্ধান্ত হত? এটার

উত্তর দেব না। তোমরাই ভেবো।

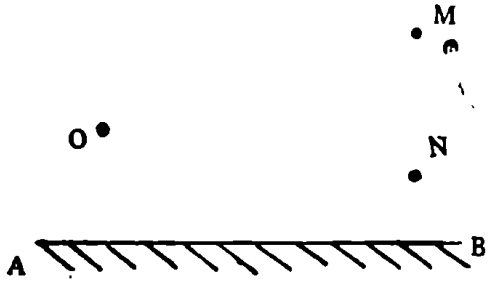

চিত্র—১৩

দ্বিতীয় প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি (১২নং ছবিতে) AB একটি সমতল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পারেন? ছবিতে 1, 2, 3, বিন্দুতে অবস্থিত বস্তুগুলির প্রতিবিম্ব তিনি দেখতে

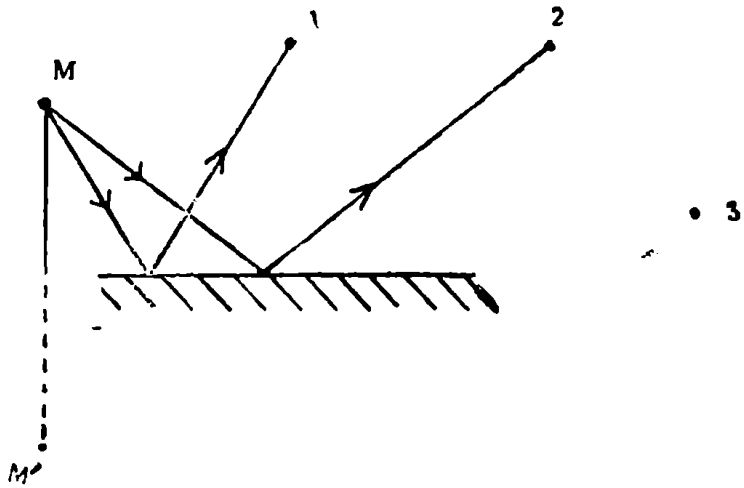

চিত্র—১৪

পাবেন কি? ১৩নং ছবি দেখলেই উত্তর পাওয়া যাবে। তিনি নিজেকে দেখতে পাবেন না এবং 3 নং অবস্থানে রাখা বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন না, কারণ এই দুই ক্ষেত্রে চোখ এবং প্রতিবিম্ব সংযোগকারী রেখা আয়নাকে ছেদ করছে না।

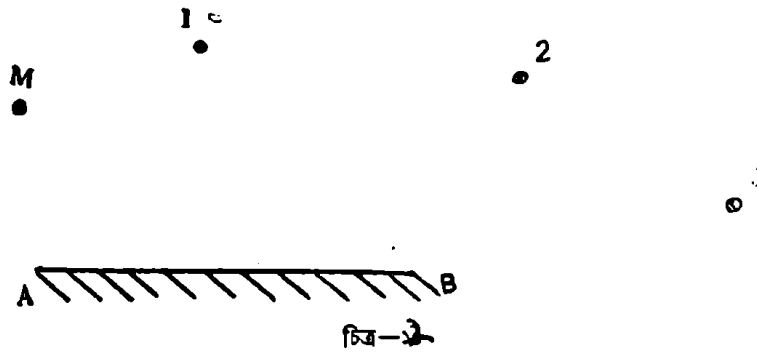

চিত্র—১৫

তৃতীয় প্রশ্ন : ১৪নং ছবিতে AB আয়নার সামনে O হচ্ছে কোন বস্তু এবং M হচ্ছে জনৈক ব্যক্তির অবস্থিতি। তিনি কি প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন? আরও বল, ব্যক্তিটি যদি N অবস্থানে চলে আসেন তাহলে প্রতিবিম্ব কোথায় সরে যাবে?

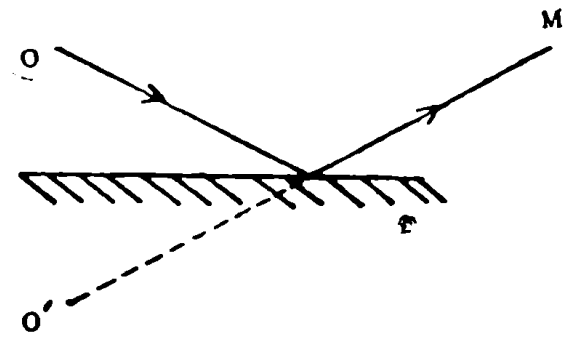

চিত্র—১৫

১৫ নং ছবিতে উত্তর পাওয়া যাবে। তিনি প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন কারণটা আগের প্রশ্নের উত্তরের মতোই। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটি খুব মজার। ব্যক্তি যেদিকে খুশি যান না কেন, বস্তু-দূরত্ব বিম্ব-দূরত্বের সমান—এই সূত্র অনুযায়ী প্রতিবিম্ব সব সময়েই O' বিন্দুতে হবে।

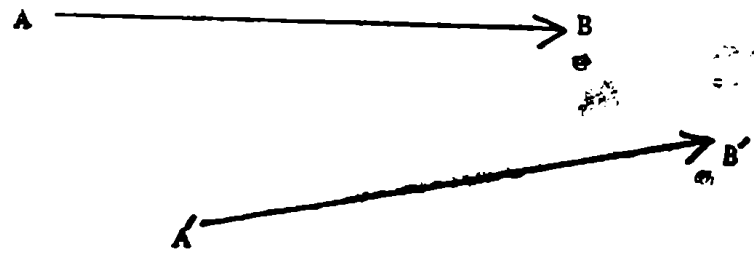

চিত্র—১৬

চতুর্থ প্রশ্ন : ১৬নং ছবি দেখ। কি রকম ভাবে আয়না রাখলে AB বস্তুটির প্রতিবিম্ব A'B' বরাবর হবে! A এবং A' বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী রেখার মধ্যবর্তী বিন্দু P এবং B ও B' বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী বিন্দু Q।

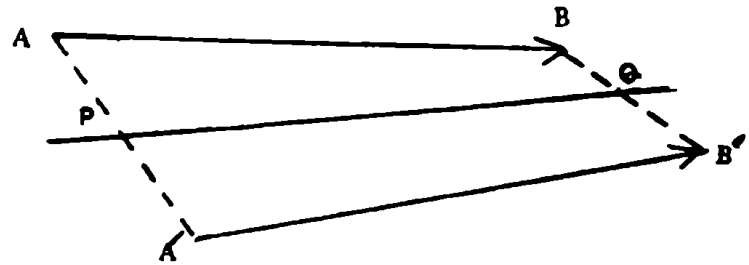

চিত্র—১৭

তাহলে PQ রেখা বরাবর আয়না বসালে AB-র প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে কারণ বস্তু দূরত্ব = প্রতিবিম্ব দূরত্ব।

কিন্তু উত্তরটা কি ঠিক হল? আমরা সমতল আয়নায় প্রতিফলকের যে সাতটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি তার ৫নং টা একটু দেখবে।

৬সি, নলিনী সরকার স্ট্রীট, কলি-৯

পুতুল নিয়ে খেলা

সোমনাথ রায়

পুতুল খেলার শখ শিবানীদেবীর ছোটবেলা থেকেই। যখন তিনি দুই বেণী দুলিয়ে, কাঁধে নিজের থেকেও ভারী ঢাউস একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ইস্কুলে যেতেন এবং মুখটা একটু ম্লান করে (ইস্কুলে কী হতো কে জানে!) ইস্কুল থেকে ফিরতেন, তখন সারা রাস্তা অদূর ভবিষ্যতে পুতুলের বিবাহ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে যেতেন এবং আসতেন। এখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছেন, তাঁর শখে আবিশ্যি কোন ভাটা পরেনি। পরমানন্দে নিত্য নতুন বিভিন্ন ধরনের বাহারী পুতুল কিনে আলমারী ভর্তি করেই চলেছেন।

একদিন বিকেলে শিবানীদেবীর বাড়ীতে গিয়েছি। গিয়ে দেখি হাত-পা ছড়িয়ে, চার পাঁচটা প্রায় একই ধরনের দেখতে পুতুল এবং লাল সাদা রঙ করা কী একটা যেন নিয়ে শিবানীদেবী খেলা করছেন। আমি গিয়ে পড়াতেও তাকে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হতে দেখা গেল না। চোখ তুলে আমাকে একবার দেখে নিয়ে, আবার নিজের কাজে মন দেন তিনি। অগত্যা আমাকেই অগ্রসর হতে হয় নিজের কৌতূহল দূর করার জন্য। জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপারটা কী। একই সঙ্গে পাঁচজনের বিবাহ সমস্যা না কি? খোঁচা গায়ে না মেখে শিবানীদেবী তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেন, 'জানো আমার কয়েকটি পুতুল বেশ বুদ্ধিমান। ওদের গোয়েন্দা বানানোর চেষ্টা করছি।'

শিবানীদেবীর কথা শুনে পুতুলগুলোকে এইবার ভালো করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করি। সবগুলোই একই ধরনের পুরুষ পুতুল—শুধু পোশাকের রঙ আলাদা। ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে আছে, ঐগুলোকে গোয়েন্দা ভাবতে কীরকম যেন লাগলো। ভাবার অবিশ্যি বেশী সময় পাওয়া গেল না, শিবানীদেবী তাঁর কল্পনা প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেন আমার কাছে—'এই যে সাদা রঙের জামা পরা পুতুলটি দেখছ—এই হলো আমার গোয়েন্দা। ভারি বুদ্ধিমান। বাকী চারটের বুদ্ধি প্রায় তোমারই মতো (খোঁচাটা ফিরিয়ে দেন আমায়), এদেরই একজন হলো গিয়ে চোর। আর এই লাল সাদা রঙ করা জিনিসটা হবে চুরি যাওয়া মাল। ভালো করে দেখ পুতুলগুলো কেমন ভাবে সাজাই। লক্ষ্য করে দেখি পুতুলগুলো এইরকম ভাবে সাজানো হয়েছে—

আমার ভালো করে দেখা হয়ে যাবার পর, শিবানীদেবী আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন—'চার কোণে যে চারটি পুতুল

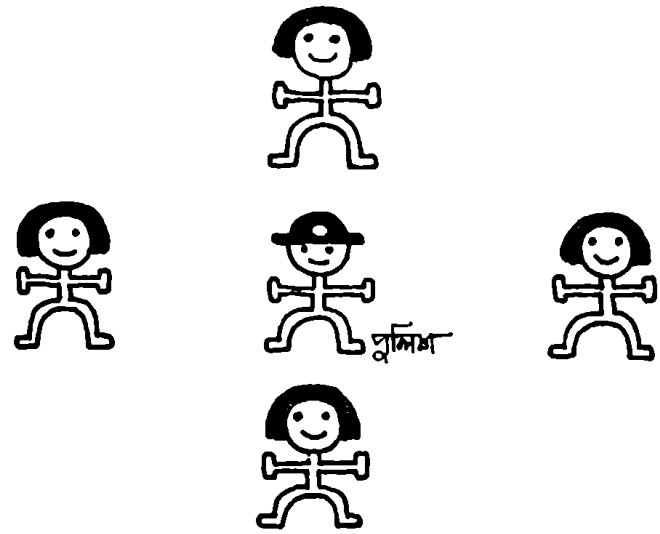

আছে, বুঝতেই পারছ ওদের যে কোন একজন হবে চোর। আমি এই ঘর থেকে চলে যাচ্ছি। তুমি যে কোন একজনকে চোর ঠিক করে ঐ লাল-সাদা জিনিসটা চোর পুতুলটার পিছনে, লাল রঙটা সামনের দিকে করে, রেখে দেবে। তোমাকে চারটে বড় দেখে টুপি দিচ্ছি, তুমি টুপিগুলি দিয়ে পুলিস পুতুলটি ছাড়া বাকীগুলোকে চুরি যাওয়া জিনিস সমেত ঢেকে রাখবে। আমি তারপর এখানে এসে পুলিস পুতুলকে জিগ্যেস করে বলে দেব কোন টুপিটার তলায় চোর পুতুলটা বামাল বসে আছে।'

আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শিবানীদেবীর নির্দেশ মতো যথাসাধ্য সব ঠিকঠাক করলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার পুলিস পুতুলটি তাঁকে চোর নির্ণয়ের জন্য ঠিকঠাক সাহায্য করল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই লাল-সাদা রঙ করা জিনিসটার বদলে যদি আমার রুমালটা চুরি যেত, তাহলেও পুলিস পুতুলটি আপনাকে বলে দিতে পারতো?' 'তাহলে পুলিস পুতুলটার বেশ অসুবিধা হতো।' —মৃদু হেসে জবাব দেন তিনি।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করে আমি অবিশ্যি চালাকিটা ধরতে পেরেছিলাম। রহস্যটা কী?

সমীকরণ

তখন বোধ হয় তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের সঙ্গে নেনতা বলে একটা ছেলে পড়ত। রেজাল্ট খুব একটা ভালো করত না কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি ছিল

খুব। সে প্রায়ই একটা মজার খেলা খেলত। আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে মনে মনে একটা সংখ্যা ভাবতে বলত সে। যে কোন সংখ্যা তবে ছোট হলে, পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলি সহজে করা যাবে। এরপর যত সংখ্যা প্রথমে ভাবা হয়েছে, ঠিক তত সংখ্যাই অন্য একজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে (খেলার খাতিরে আর কি) প্রথম সংখ্যার সঙ্গে যোগ করতে বলত নোস্তা। ধরা যাক, আমি মনে মনে ভেবেছি 4, গুড়ুম বলে আমার আর একজন বন্ধুর কাছ থেকে ঐ চার ধার করে আমার চার-এর সঙ্গে যোগ করতে হত। এরপর নোস্তা একটা সংখ্যা বলত দুই, চার কি ছয়—ওর যা খুশী। সেটা আমার করা যোগফলের সঙ্গে (অর্থাৎ $4+4=8$ এর সঙ্গে) যোগ করতে হত। নোস্তার পরবর্তী নির্দেশে মোট যোগফলের অর্দ্ধেক করতে হত। বন্ধুর কাছ থেকে যা ধার করেছিলাম, তা ফেরত দিতে হত। এরপর হাতে যা পরে থাকত সেটা নোস্তা একেবারে নির্ভুলভাবে বলে দিত। আমারাও খুব আশ্চর্য হয়ে যেতাম। নোস্তাকে জিজ্ঞাসা করতাম রহস্যটা কি জানার জন্যে, ও কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গত না। পরে অবিশ্যি আমি রহস্যটা বুঝতে পেরেছিলাম।

ব্যাপারটা আর কিছুই না—সহজ সমীকরণ। বীজ-গণিতের ভাষা। বিজ্ঞানী নিউটন তাঁর বই Arithmetica Universalis'-এ লিখেছেন, 'In order to settle a question referring to numbers or to the abstract relationships between quantities, one needs only to translate the problem from one's own language to the language of aljebra.' অর্থাৎ কিনা বিভিন্ন সংখ্যা পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে সব সমস্যা, তার সমাধান-এর জন্য দরকার সমস্যাটিকে নিজের ভাষা থেকে বীজগণিতের ভাষায় অনুবাদ করা। যেমন উপরের রহস্যটার কথাই ধরা যাক। আমি মনে মনে ভাবলাম x, বন্ধুর কাছ থেকে x ধার নিয়ে যোগ করলে, যোগফল দাঁড়ায় $x+x=2x$; এরপর নোস্তার বলা কোন একটা সংখ্যা, ধরা যাক y, যোগ করে যোগফল হয় $2x+y$; এর অর্দ্ধেক করলে হয় $x+\frac{y}{2}$। বন্ধুর সংখ্যা বন্ধুকে ফিরিয়ে দিলে পরে থাকে $(x+\frac{y}{2}-x)$ বা $\frac{y}{2}$; অর্থাৎ নোস্তা যে সংখ্যাটা বলেছিল, তার অর্দ্ধেক। ফলে, নোস্তার কোন অসুবিধাই হত না ঐ 'ম্যাজিক' দেখাতে। অবশ্য ওকে খেয়াল রাখতে হত যাতে ওর বলা সংখ্যাটা যেন জোড় হয়। কারণ, y বিজোড় হলে $\frac{y}{2}$ পূর্ণ সংখ্যায় আসবে না।

বিখ্যাত অঙ্কবিদ্ ডিয়োফ্যাণ্টাস-এর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। যেটুকু জানা গেছে সেটা তাঁর কবরের শিলালিপি। তা অনেকটা এই রকম :

পথিক ! এইখানে ডিয়োফ্যাণ্টাস-এর নশ্বর দেহ শায়িত আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার যে তাঁর আয়ু সংখ্যার দ্বারা নির্ণয় করা যায়। তাঁর জীবনের এক-ষষ্ঠাংশ হলো তাঁর শৈশব। এরপর তাঁর জীবনের এক দ্বাদশাংশ নানাভাবে কাটাবার পর তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের পর জীবনের এক-সপ্তমাংশ কেটে যাওয়ার পরও তাঁর কোন সন্তান হয়নি। আরও পাঁচ বছর পর তিনি তাঁর প্রথম সন্তানের মুখ দেখেন। তাঁর জীবনের মাত্র অর্ধেককাল সময় তিনি সেই পুত্রের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তার পরেই পুত্রটি মারা যায়। পুত্র মারা যাবার পর ভগ্নহৃদয় ডিয়োফ্যাণ্টাস আর মাত্র চার বছর বেঁচেছিলেন। না, না—মারা যাবার সময় ডিয়োফ্যাণ্টাস-এর কত বছর বয়স হয়েছিল—এই ধরনের বাজে প্রশ্ন করে তোমাদের ঝামেলায় ফেলব না। তোমরা বরং সহজ প্রশ্নটারই উত্তর দাও—ডিয়োফ্যাণ্টাস-এর ছেলে কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিল ? তখন ডিয়োফ্যাণ্টাস-এর বয়স-ই বা কত ছিল ?

সমীকরণের দুই পক্ষকে সর্ব সমান হতেই হবে। বাম পক্ষের সঙ্গে যা যোগ বা বিয়োগ করা হবে বা যত সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করা হবে, ডান পক্ষের সঙ্গেও তত সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করতে হবে অথবা তত সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করতে হবে। তবে '0' দ্বারা ভাগ করা কিন্তু চলবে না। এই শর্তগুলো না মানলে বা বর্গমূল করার সময় একটু সতর্ক না থাকলেই চিত্তির ! মজাদার সব ফল পাওয়া যাবে।

যেমন এই সমীকরণটা দেখা যাক—

$4-10=9-15$

বা, $4-10+\frac{25}{4}=9-15+\frac{25}{4}$ [উভয় পক্ষে $\frac{25}{4}$ যোগ করে]

বা, $2^2-2\cdot2\cdot\frac{5}{2}+(\frac{5}{2})^2=3^2-2\cdot3\frac{5}{2}+(\frac{5}{2})^2$

বা, $(2-\frac{5}{2})^2=(3-\frac{5}{2})^2$

বা, $2-\frac{5}{2}=3-\frac{5}{2}$ [বর্গমূল করলে]

বা, $2=3$ [উভয়পক্ষে $\frac{5}{2}$ যোগ করে]

বা, এইটা—

$a^2-a^2=a^2-a^2$

বা, $a(a-a)=(a+a)(a-a)$

বা, $a=a+a$ [$(a-a)$ দ্বারা ভাগ করে]

বা, $a=2a$

বা, $1=2$ [উভয়পক্ষকে a দ্বারা ভাগ করে]

এক টাকার এক চতুর্থাংশ হলো 25 পয়সা। যদি এইরকম ভাবে লিখি—

$\frac{1}{4}=25$ বর্গমূল করলে পাই $\frac{1}{2}=5$ অর্থাৎ কিনা এক টাকার অর্দ্ধেক হলো পাঁচ পয়সা! বোঝ ঠ্যালা! কিন্তু গণ্ডগোলটা কোথায়? (আগের দুটোরও)

সমীকরণের অঙ্ক করেছে অথচ 'দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কি তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার'···ধরনের অঙ্ক করে নি এমন পারিক আমি বাদ দিয়ে আর কেউ নেই। অনেক দুঃখে ছেড়েছিলাম। নীচের সমস্যাটা পড়লেই দুখুটা বুঝবে—

একটি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফল আট। সংখ্যাটি হতে 18 বিয়োগ করলে অন্তরফলের অঙ্কদ্বয় পরস্পর সমান হয়। সংখ্যাটি কত? কর-মোছ আবার কর পদ্ধতিতে (Trial method) কিন্তু কোর না!

সমস্যাটির সমাধান অবশ্য অন্য রকমভাবেও করা যায়, সমীকরণের সাহায্যে করলে আমার দিকে চেয়ে একটু বাঁকা হাসি দেওয়া যেত; এই আর কি।

উত্তর

পুতুল নিয়ে খেলা—আসলে ঐ লাল-সাদা রঙ করা জিনিসটা হচ্ছে একটা দণ্ড চুম্বক, যার লাল দিকটা হলো 'N' মেরু। আর পুলিস পুতুলটার মাথায় গোপন জায়গায় বসানো ছিল একটা কম্পাস। তার পরের ব্যাপারটা·····।

সমীকরণ—ডিয়োফ্যাণ্টাস-এর বয়স এই সমীকরণটা থেকে পাওয়া যাবে :—

$x=\frac{x}{6}+\frac{x}{12}+\frac{x}{7}+5+\frac{x}{2}+4$ সমীকরণ সমাধান করে পাই $x=84$

উনি বাবা হয়েছিলেন $\frac{84}{6}+\frac{84}{12}+\frac{84}{7}+5$ বা, $14+7+12+5$ বা, 38 বছর বয়সে। পুত্র মারা যায় তখন ডিয়োফ্যাণ্টাস-এর বয়স $84-4=80$

অতএব মারা যাবার সময় পুত্রের বয়স হয়েছিল $80-38=42$।

(i) উভয়পক্ষের বর্গ সমান হলেও উভয় পক্ষের প্রথম ঘাত সমান নাও হতে পারে। যেমন $(-5)^2=5^2$, কিন্তু -5 এবং 5 সমান নয়। প্রদত্ত সমস্যাটি ছোট করলে দাঁড়ায় $(-\frac{1}{2})^2=(\frac{1}{2})^2$ কিন্তু $-\frac{1}{2}$ ও $\frac{1}{2}$ সমান নয়।

(ii) $a-a=0$, '0' দিয়ে ভাগ করা যায় না।

(iii) $\frac{1}{4}=25$ এটাতে কোন একক নেই, অথচ বাম পক্ষের একক টাকা এবং ডান পক্ষের একক পয়সা। একক বসালেই উভয়পক্ষ সর্ব সমান থাকছে না, হয় দুটোকেই টাকায় নিয়ে যেতে নতুবা পয়সায়।

(iv) একটি সমীকরণ হবে $x+y=8$, অন্যটিতেই ঝামেলা। দুটো ধারণা করা যেতে পারে $y>8$ বা $y<8$ [x দশকের অঙ্ক এবং y এককের অঙ্ক ধরে] অতএব যখন 18 বিয়োগ করা হচ্ছে, $y<8$ হলে, সমীকরণটি দাঁড়ায়, $x-(1+1)=10+y-8$ বা, $x-y=4$ এইবার ঐ দুই সমীকরণ সমাধান করলে পাওয়া যায় $x=6$ এবং $y=2$, অতএব সংখ্যাটি $10\times6+2=62$। $y>8$ হলে y-এর একমাত্র মান দাঁড়ায় 9, কিন্তু x-এর মান দাঁড়ায় $x+9=8$ বা $x=-1$, যা সম্ভব নয়।

ডঃ তারকমোহন দাসের জীবনবিজ্ঞানের প্রথমপাঠ ও
পার্থসারথি চক্রবর্তীর মাটি থেকে আকাশে
এই সংখ্যায় অনিবার্য কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

—সম্পাদক

যমের খাস দূত

গঙ্গেশ বিশ্বাস

সমুদ্র বোলতা

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মানুষের যে কত ভয়াল শত্রু আছে, তার সংখ্যা বোধ হয় আজও নির্ধারিত হয় নি। বনে-জঙ্গলে সাপ-বাঘ, নদী-নালা, কুমীর-কামট, সমুদ্রে হিংস্র মাংসাশী-হাঙর, বিষছর সর্প. বিষাক্ত মাছ তো আছেই, আকাশে বাতাসেও রয়েছে কত মারাত্মক রোগ-জীবাণু, ভাইরাস প্রভৃতি। সভ্য-শহরের বাড়ী-ঘরের আনাচে কানাচে যত বিষাক্ত কীট, বিছে প্রভৃতি বাস করে, তার সংখ্যাও বড় কম নয়। পৃথিবীর সব থেকে বিষাক্ত এবং ভয়ঙ্কর প্রাণীটি কিন্তু আফ্রিকার কৃষ্ণমাম্বা[1] (black mamba) কিম্বা ভারতের শঙ্খচূড়[2] (king cobra) নয়. আর সে কাউকে কামড়াও না। এমনিতে ভারী শান্তশিষ্ট, নড়াচড়ার ক্ষমতাও নেই বিশেষ। কিন্তু বোলতার মতো শত্রুর শরীরে হুল বিঁধিয়ে মারাত্মক প্রাণীজ-মারণবিষ প্রয়োগ করে সে সুযোগ পেলেই।

কালান্তক যমের দূতটি এক সামুদ্রিক প্রাণী। বোলতার আক্রমণ ভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করে এর নাম দেওয়া হয়েছে সমুদ্র বোলতা (Sea wasp)। জীবন্ত অবস্থায় এর কণিকা বা 'দাড়া' (tentacle) কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কোন মানুষের শরীরে লেগে থাকলে, মিনিট খানেকের মধ্যে তার মৃত্যু অনিবার্য। এর বিষের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নি আজও।

সমুদ্র-বোলতা কি—জীববিজ্ঞানে প্রাণীটির নাম চীরনেক্স ফ্লিকেরি (Chironese flickeri)। সমুদ্র বোলতা চীরনেক্স গণ (Chironese genus)-এর ফ্লিকেরি প্রজাতি (Flickeri specis)-এর জেলি মাছ। নামে মাছ হলেও, এটি মোটেও খাবার মতো বস্তু নয় কিন্তু। পুরী, দীঘা কিম্বা ভারতের কোন সমুদ্রোপকূলে যারা বেড়জালে মাছ তুলতে দেখেছে, তারা হয়ত কোন-এক ধরনের জেলি মাছ দেখে থাকবে। জেলেরা জাল থেকে ছাড়িয়ে দেয় এই মাছ। জেলি মাছ শতকরা 95 ভাগ স্বচ্ছ জলীয় দ্রবাদ্বারা তৈরী অমেরুদণ্ডী প্রাণী। 200 প্রজাতির জেলি মাছের কোনটি একটি মটর দানার মতো, কোনটি আবার দু'মিটার ব্যাসের এক ঢাউস-প্রাণী।

চীরনেক্স ফ্লিকেরি দেখতে কতকটা টেবিল-বেল বা হেমলেট ধরনের প্রাণী (চিত্র নং—1) ব্যাস প্রায় 2·0 সেণ্টিমিটার, উচ্চতা 10 সেমি.-এর মতো। শরীরের বেড়ের চারস্থান থেকে নীচের দিকে ঝোলে চল্লিশ-পঞ্চাশটি নীল বা ঈষৎ-লাল রঙের দাড়া. কোনটির দৈর্ঘ্য 10-20 সেমি., কোনটির বা এক দেড় মিটার। প্রতিটি দাড়ায় থাকে লক্ষ লক্ষ আণুবীক্ষণিক জীবকোষ (nematocys বা Cnidoblast cell)। চীরপসালমাস (Chiropsalmus) এই রকম আর-এক পরিবার ভুক্ত প্রাণী।

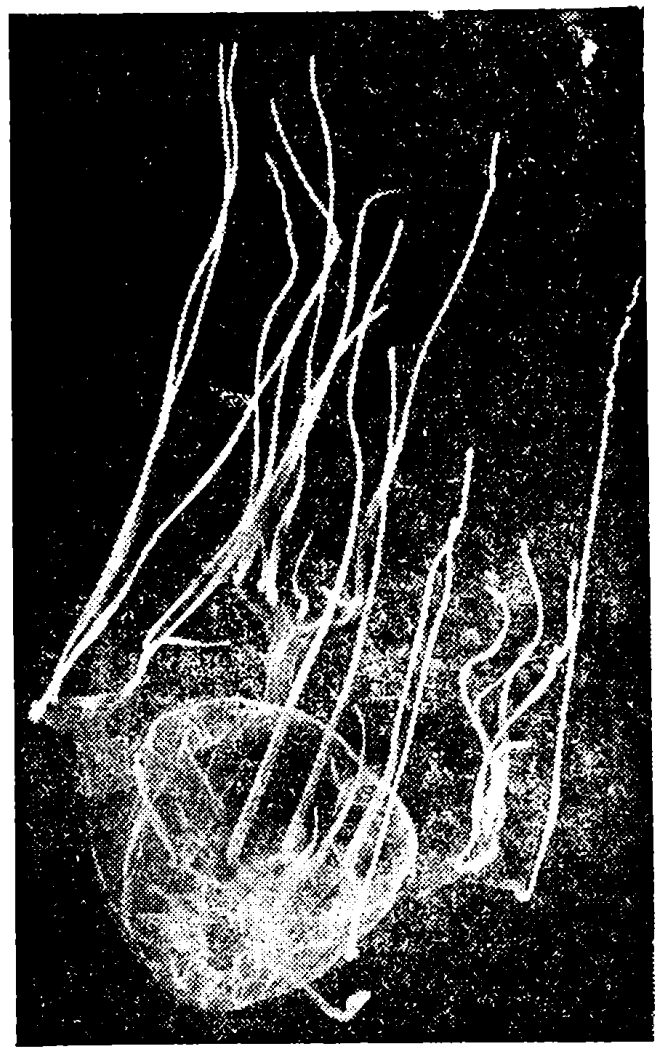

সমুদ্র বোলতা ছবি : পরিজাত পল্লব বিশ্বাস

বাসস্থান—অস্ট্রেলিয়ার উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব উপকূলে প্রায় অদৃশ্য ভাবে ভেসে বেড়ায় চীরনেক্স। উত্তর-পূর্বকূলে ঘন-ঘন স্নানার্থীদের অনেকের ভয়াবহ মৃত্যু একসময় ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তোলে বিজ্ঞানীদের। অবশেষে জানা যায় অদৃশ্য ঘাতকটি চীরনেক্স ফ্লিকেরি। অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র

বোলতা-বিশেষজ্ঞ সাউথকট (Southcott)-এর বিবরণ অনুযায়ী এর আক্রমণে মানুষের মৃত্যু হতে পারে 30 সেকেণ্ড থেকে তিনঘণ্টার মধ্যে—সময়টা নির্ভর করে প্রাণীটি কি পরিমাণ বিষ ইনজেকশান করেছে তার ওপর। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত-ব্যক্তি তীরভূমি দিয়ে কয়েক গজ মাত্র এগিয়ে যেতে না-যেতেই মারা যায়।

সমুদ্র বোলতা অস্ট্রেলিয়াতে বেশি হলেও উত্তর-আমেরিকার ফ্লোরিডা, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপ, বাহামা, ব্রেজিল, ফিলিপাইন, পশ্চিম-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সমুদ্রোপকূলেও দেখা যায় এদের।

প্রকৃতি—সমুদ্রবোলতার ধরনের প্রাণীরা দৃশ্যত শান্ত এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ। শীতের শান্তসমুদ্রে পালতোলা ভারী নৌকার মতো ধীরে ধীরে এরা যখন কূলে-কূলে প্রায় অদৃশ্যভাবে চলে বেড়ায়, খুব তীক্ষ্ম নজর না থাকলে ধরতে পারা যায় না তাদের গতিবিধি। আত্মরক্ষায় অসমর্থ মনে হলেও প্রকৃতি এদের সজ্জিত রেখেছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে।

হুলসংশ্লিষ্ট নেমাটোসিস্ট-কোষ থাকে এদের দাড়ার চামড়ার ঠিক নীচেই। মানুষের ত্বকের দ্বিতীয় স্তর (dermis) ভেদ করতে পারে বলে নেমাটোসিস্টকে বলা যায় প্রকৃতির ডার্মিস ভেদকারী ছুঁচ (hypodermic needle)। কোষের মধ্যে থাকে একটি বিষপূর্ণ ক্যাপসুল। অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত সুতোর মতো একটি দীর্ঘ নল কুণ্ডলী পাকান অবস্থায় অবস্থান করে ক্যাপসুলে। সুতোর ডগাটা বল্লমের ফলার মতো ছুঁচাল। ক্যাপসুল থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে ছোট্ট এক টুকরো রোঁয়া (cnidocil), বোমার পলতের মতো। গুটানো সুতোর গায়ে গায়ে থাকে কাঁটা তারের মতো কাঁটা। বোমার পলতেয় আগুন ছোঁয়ানোর কয়েক-সেকেণ্ডের মধ্যে যেমন ঘটে যায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, সমুদ্র বোলতার সেই রোঁয়াটি কোন শত্রুর গা স্পর্শ করার সঙ্গে-সঙ্গে তেমনি তীব্র বেগে সুরু হয়ে যায় প্রাণীটির বিষপ্রয়োগের প্রক্রিয়া —সুতোনল তীব্রবেগে ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে এসে শত্রুর দেহ প্রবেশ করে ঢুকতে থাকে করাল বিষ! সুতো চামড়ার ভেতরে ঢুকতে থাকলে, সুতোর কাঁটাগুলো শক্ত ভাবে আটকে যায় ভেতরে, যাতে সুতোটা ফসকে বেরিয়ে আসতে না পারে। ওদিকে সুতো যত শত্রুর চামড়ার ভেতরে ঢুকতে থাকে, ক্যাপসুলের মধ্যে কুণ্ডলীর পাকও তত খুলতে থাকে—এইভাবে শত্রুর শরীরে বিষঢালা চলতেই থাকে কোন স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রের মতো। আক্রমণের সময় সুতো ক্যাপসুলের ভেতর থেকে এত জোরে বেরিয়ে আসে যে, সুতোর ডগা সার্জেন-এর ভারী দস্তানাকেও ভেদ করে যেতে পারে, মানুষের চামড়া তো তার কাছে তুচ্ছ। বিভিন্ন প্রজাতির জেলি মাছের বিষ প্রয়োগের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে নানারকম তারতম্য।

চীরপসামাস-এর প্রকৃতিও একই রকম মারাত্মক।

বিষের উপসর্গ—কথায় বলে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'। কথাটা সত্য হলেও, বাঘের দাঁতের ঘাগুলো থাকে শরীরের বাইরে, কিন্তু সমুদ্র বোলতার সংস্পর্শে মানুষের শরীরের ভেতরে—বাইরে যা-যা ঘটে তা নিতান্তই শোচনীয়। চীরনেক্সের বিষে থাকে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্ষতি-কারক দ্রব্য (Cardiotoxin)। বিষের যে সব উপসর্গ প্রকাশ পায়, সেগুলি হল :

আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হুল বেঁধার চরম যন্ত্রণা বোধ; কথিকা স্পর্শ করার স্থানে দেখা দেয় আধাপাড়া লাল দাগ শক্ত ফুস্কুড়ীযুক্ত ক্ষত; অঙ্গপত্যঙ্গের অসাড়তা, মাথাঘোরা, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিকলতা, নিদারুণ শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ—অবশেষে মৃত্যু। কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক (Antidote) নেই এর।

পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার

ভেসেথাকা বৈশিষ্ট্যযুক্ত হাইড্রোজোয়া শ্রেণীর (phylum coelenterata) জেলিজাতীয় এক গণের (physalia genus) সামুদ্রিক প্রাণীর সাধারণ নাম পর্তুগীজ-যুদ্ধজাহাজ (portuguese man-of-war)। এই প্রাণীটিও সমুদ্র বোলতার মতো দাড়াযুক্ত এবং ভয়ঙ্কর, তবে অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক।

বাসস্থান—পৃথিবীর তাবৎ উষ্ণ সমুদ্রে রয়েছে এদের আবাস। সব থেকে বেশি মেক্সিকো উপসাগরীয় অঞ্চলে এবং ফ্লোরিডার নিকটবর্তী গালফ-স্ট্রীম নামক সমুদ্র-স্রোতের মধ্যে। গ্রীষ্ম এবং উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরেও রয়েছে এদের অস্তিত্ব। কোথাও কোথাও এদের পাল তোলা জাহাজের মতো ভেসে থাকতে দেখা যায় হাজারে হাজারে। পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে কেবল ফাইসেলিয়া ফাইসেলিস (physalia physalis)। Physalia, Utriculus, Physalia Tentacula প্রভৃতি আরো প্রজাতি আছে পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার গণের মধ্যে।

ম্যান-অব-ওয়ারের আকৃতি-প্রকৃতি—এই গণের প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এরা জলে ভেসে থাকে। লম্বায় 9 থেকে 30 সেমি.; জলের ওপরের অংশের উচ্চতা প্রায় 15 সেমি.। দেহের ওপরের দিকটা ঈষৎ স্বচ্ছ, একটি গ্যাসভর্তি ব্লাডার বিশেষ। ব্লাডারের গা থেকে

হালকা লাল, নীল বা বেগুনী আভা বিচ্ছুরিত হয়। প্রাণীটি নড়াচড়া করে তার চূড়ার সাহায্যে। চূড়া কাজ করে নৌকোর পালের মতো। যখন যেদিকে বাতাস বয়, সেইদিকে ভেসে চলে প্রাণীটি।

যুদ্ধ জাহাজের পেটের তলায় (চিত্র নং-2) থাকে নলের ধরনের তিন প্রস্থ পলিপ (Polyp) বিশেষ। একপ্রস্থ পলিপ (Ductylozooid) থেকে ঝোলে 50-60টি কাঁষিকা। 50 মিটার (165 ফুট) পর্যন্ত দীর্ঘ হয় কোন-কোন কাঁষিকা। প্রতিটি দাঁড়ায় থাকে তীব্র বিষপূর্ণ নেমাটোসিস্টক-কোষ। এরা জীবনধারণ করে ছোট ছোট মাছ খেয়ে। প্রথমে দাঁড়ার সাহায্যে মাছ আটকে, তার শরীরে বিষ চালিয়ে অবশ করে ফেলে তার শরীর ; তারপর এক প্রস্থ পলিপ (gastrozooid)-এর সাহায্যে আত্মসাৎ করে বিবস মাছটি। নিজে সশস্ত্র হলে কি হবে, সে আবার মাথামোটা সামুদ্রিক কচ্ছপ (loggerheaded turtle)-এর পেটে যায়।

নমেউস (Nomeus gronovii) নামক এক ধরনের ছোট (৪ সেমি-এর মতো লম্বা) মাছ নিরাপদে বাস করে পর্তুগীজ-যুদ্ধজাহাজের দাঁড়ার ঝোপে। নমেউসকে উদরসাৎ করার লোভে অন্য মাছ এগিয়ে এলে তাদের ধরে সেবা লাগায় জাহাজ। ঝরতি-পড়তি উচ্ছিষ্ট আর জাহাজের সদা-পচনশীল ঠ্যাং খেয়ে বেঁচে থাকে বেচারা নমেউস। যুদ্ধ জাহাজের বিষ কোন ক্ষতি করে না নমেউসের। অবস্থা দেখে মনে হয় জাহাজ নিজের স্বার্থেই রক্ষা করে নমেউসকে। যুদ্ধ জাহাজ আর নমেউসের যৌথ জীবন মিথোজীবিতা (symbiosis)-এর এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। মিথোজীবিতা হল দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জীবের পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপনের পদ্ধতি।

বিষের ফল—শরীরে বিষ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তি অনুভব করে হুল-ফোটানোর তীব্র যন্ত্রণা, জ্বলুনী, সর্বাঙ্গে ছুঁচ ফোটার ধরনের অনুভূতি ; চামড়ায় প্রকাশ পায় প্রদাহজনিত ফুস্কুড়ি, ফোসকা, ; দেখা দেয় অভিঘাত (shock) এবং মৃতপ্রায় নির্জীবতা (collapse) —মৃত্যু ঘটে, তবে সমুদ্র বোলতার তুলনায় অনেক কম।

চীরনেক্স চীরপসালমাস, পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার প্রভৃতি প্রাণীর আক্রমণের প্রচণ্ডতা নির্ভর করে প্রাণীটির কাঁষিকা কতক্ষণ আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের সংস্পর্শে থাকে এবং কতগুলো নেমাটোসিস্ট হুল ফোটাল, তার ওপর। যুদ্ধজাহাজের মৃত্যুর অনেকদিন পরেও থাকে তার হুলের বিষের ক্ষমতা। দু'বছরেরও বেশিদিন সক্রিয় থাকে এর শুকন-দাঁড়ার বিষ।

প্রতি বছর কত লোক যে এদের শিকার হয় বিভিন্ন সমুদ্রোপকূলে, তার নির্ভুল হিসাব সম্ভবতঃ কারো কাছেই নেই। সংখ্যাটি এক লক্ষ হওয়াও বিচিত্র নয়। 1964 সালের মার্চে, মাত্র একদিনেই মিয়ামি (ফ্লোরিডা) সমুদ্রতীরে,

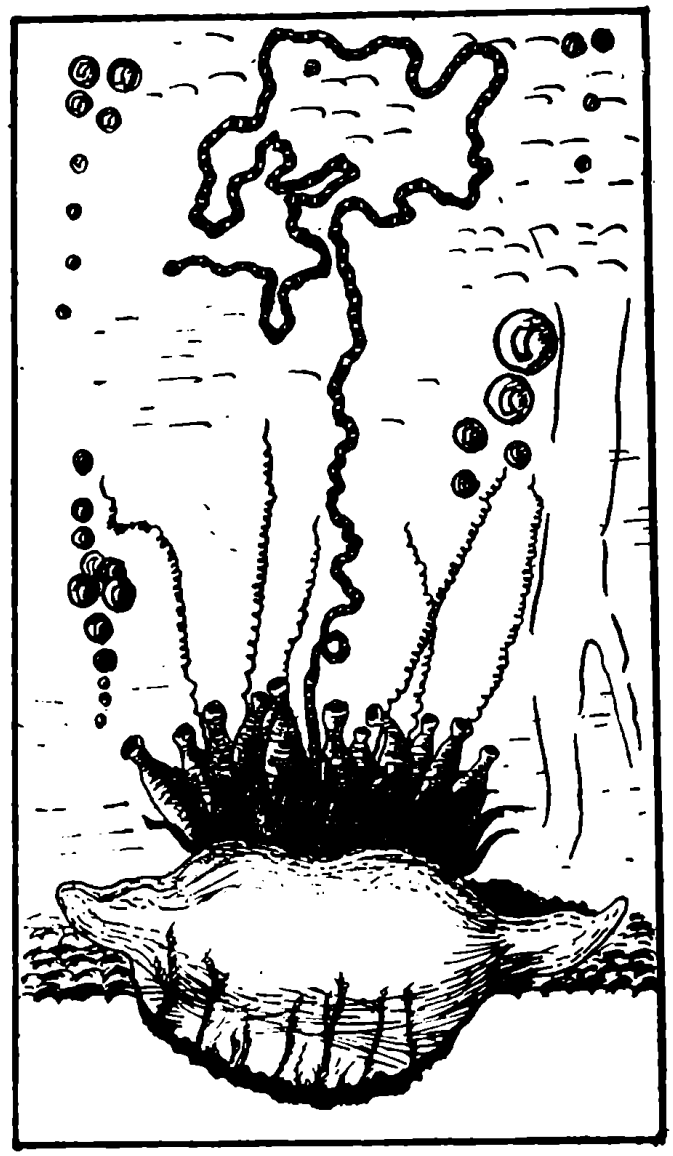

পর্তুগীজ ম্যান অব ওয়ার এর এক প্রজাতি

ম্যান-অব-ওয়ারের আক্রমণের চিকিৎসা[1] হয় 400-এরও বেশি স্নানার্থীর।

মজার কথা, মানুষ আবার এদেরই আর এক পরিবারে প্রাণীর ঠ্যাংয়ের ঝোলও খায়। জানি না তা গলদাচিংড়ির ঝোলের মতো লাগে কিনা।

1-Black mamba (Dendroaspis polylepsis)

বিচরণ ভূমি ইথিওপিয়া, সোমালিয়া নাটাল এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা। পৃথিবীর অন্যতম ভীষণ বিষাক্ত সাপ। একটি মাত্র বড় কৃষ্ণমাম্বা দশজন মানুষ মারার পক্ষে যথেষ্ট বিষ ঢালতে সমর্থ।

2 king cobra (ophiophagus hanna)-বাসভূমি ভারত, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন। পৃথিবীর বৃহত্তম বিষধর সর্প, কোন কোনটি 16 ফুটেরও বেশি লম্বা। কামড়ানোর আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয় মানুষের। ভারতে সুন্দরবন, উড়িষ্যা, হিমালয়ের তরাই-অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে দেখা যায় এদের। হাঙ্গামা বুঝলে একটা বড়-শঙ্খচূড় মানুষের মাথা-সমান উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, একটা লম্বাটে ফণা বিস্তার করে, বেশ জোরে হিস্ হিস্ শব্দ করতে থাকে। সাপই এদের আহার্য। এরা বন-জঙ্গলের সাপের সংখ্যা কমিয়ে রাখে বলে এদের সংরক্ষণ প্রয়োজন।

[৪]গণ (genus)—ধরা যাক রুই মাছ তিন প্রকার—লাল, সাদা, কালো। যদি স্বাভাবিকভাবে লালের বংশে পর পর লাল রুই জন্মে, তেমনি সাদার বংশে সাদা, আর কালোর বংশে কালো, তবে সাম্প্রতিকভাবে রুই হবে গণ (Labeogenus), আর লাল, সাদা, কালো হবে তিন প্রজাতি (species)।

[৫]পর্তুগীজ-ম্যান-অব-ওয়ার—ফাইজেলিয়া-গণের প্রাণীরা দেখতে অনেকটা পালতোলা-জাহাজের মতো, আর স্বভাবে পর্তুগীজ জলদস্যুদের মতো পৈশাচিক বলে হয়তো এদের নামটা ঐ রকম। ম্যান-অব-ওয়ার কথাটির অর্থ যুদ্ধ জাহাজ।

[৬]চিকিৎসা—আক্রমণের তীব্রতা অনুযায়ী মৃদু চর্মপ্রদাহ (dermatitis) থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে আক্রান্ত ব্যক্তির। তিনটি বিষয়ের প্রতি চিকিৎসকের দৃষ্টিদানের প্রস্তাব আছে—ব্যথা উপশম, বিষের স্নায়বিক উপসর্গ (neurotoxic effect) হ্রাস এবং প্রাথমিক অভিঘাত (primary shock) দূর করা। এই উপলক্ষে প্রথমতঃ সমুদ্রতীরে উপস্থিত কোন ব্যক্তির উচিত আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে কঁষিকা সমূহ তুলে ফেলা, কিন্তু কক্ষনো খালি হাতে নয়। দ্বিতীয়তঃ আক্রান্ত স্থানে কোহল, জলীয়-অ্যামোনিয়া, সান-ট্যান-লোশন (sun- tan lotion), তেল বা ঐ ধরনের কোন তরলের প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন—এতে নেমাটোসিস্ট আর অতিরিক্ত বিষ ঢালতে পারে না। সবশেষে হৃদযন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্রের উদ্দীপক-ওষুধ (stimulant) প্রয়োগ।

ঋষি বঙ্কিম সরণী, পোঃ-কাঁথি, জেলা-মেদিনীপুর।

বহুরূপী

ভদ্রা ঘোষ

বহুরূপী সাধারণতঃ আমরা বাগানে বা বনে-জঙ্গলে দেখিয়ে থাকি। ইহারা রেপ্‌টিলিয়া শ্রেণীর স্কুয়ামেটা বর্গের (Order-Squamata) ও সাউরিয়া উপবর্গের অন্তর্গত। ইহাদের গোত্র আগামিডি। সাউরিয়া উপবর্গের এই প্রাণীদের সাধারণ ভাবে লিজার্ড বলা হয়। তবে Lizards বলিতে টিকটিকি বা গৃহগোধিকা ও গোসাপ প্রভৃতি প্রাণীদিগকেও বুঝায়। বহুরূপীর ইংরাজী নাম Garden Lizard. ইহার বিজ্ঞানসম্মত নাম ক্যালোটিস্ ভার্সিকলর ((balates versicolor)।

'বহুরূপী কথাটি হইতেই বুঝা যায় প্রাণীটির বহুরূপ। কিন্তু, এই বহুরূপ হইবার কারণ কি? ইহার একটি বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে।

বহুরূপী বা গিরগিটির সারা দেহ ছোট ছোট আঁইশ দ্বারা আবৃত। ইহাদের আঁইশ মাছের ন্যায় চর্মের ভিতরের স্তর হইতে বাহির না হইয়া বাহিরের স্তর হইতে বাহির হয় ও ৩৫ হইতে ৫২টি সারিতে সজ্জিত থাকে। প্রত্যেকটি আঁইশ একে অপরকে আংশিকভাবে আবৃত করিয়া রাখে। আঁইশগুলি গোলাকার হওয়ায় পাশাপাশি অবস্থান কালে একটি ছোট রন্ধ্রের সৃষ্টি করে।

বহুরূপীর চামড়া খুবই পাতলা। এই চামড়ার অভ্যন্তরে অনেকগুলি ছোট ছোট কোষ থাকে। ঐ কোষগুলির কোন কোনটি ছোট ছোট দানায় পূর্ণ থাকে। ঐ সকল কোষে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সাদা রঙ সৃষ্টি করে। কোন কোন কোষ আবার তৈল বিন্দুতে পরিপূর্ণ থাকে। ঐসকল কোষের তৈলবিন্দুতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া যে হলুদ বা সবুজাভ রঙ সৃষ্টি হয় তাহা ঐ আঁইশের ফাঁকে অবস্থিত রন্ধ্রের মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হইয়া সারা গায়ে ছড়াইয়া পড়ে। তখন ইহাদের গাত্রবর্ণ হলুদ বা সবুজ হইয়া যায়। আবার অন্য কতগুলি কোষে এক-প্রকার বাদামী অথবা লালচে রঙের রঞ্জক পদার্থ থাকে। গিরগিটি দেহের সঙ্কোচন প্রসারণের দ্বারা রঞ্জক পদার্থটি নাড়াচাড়া হয় ও সূর্যরশ্মি যখন ঐ পদার্থটির উপর পতিত হয় তখন লাল রঙ বিচ্ছুরিত হয় ও উহাদের দেহের রঙ পরিবর্তন করিয়া লালে পরিণত হয়। এই ভাবে গিরগিটি গাত্রবর্ণ পরিবর্তন করিতে পারে। সেই কারণেই গিরগিটির আর এক নাম বহুরূপী।

মানকুণ্ড, ৩৮, মানকুণ্ড, রামকুমার ব্যানার্জী সরণী, জিলা—হুগলী।

খুদে বৈজ্ঞানিকদের আসর

কিন্নর রায়

জওহর শিশুভবনের বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী

সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রালের উঠোনে ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা মডেল সাজিয়েছিলেন ৫-৯ ফেব্রুয়ারী। শীতের আশ্চর্য রোদে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মেলা, নানান মডেল, সে এক দারুণ ব্যাপার। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন জওহর শিশু-ভবন এবং ভারত সরকারের এন সি ই আর টি। ২৩৮টি বিজ্ঞান মডেল ছিল প্রদর্শনীতে। পনেরটির মতো সায়েন্স ক্লাব আর বেশ কিছু স্কুল এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিল।

৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পাণ্ডে। মাথার ওপর ছাউনি বলতে আকাশ, সেই মঞ্চের ওপর থেকে রাজ্যপাল বললেন, আমাদের আগামী প্রজন্মকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজ সেবার কাজে উৎসাহিত করতে হবে। যাতে তাঁরা সাধারণ মানুষকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সমৃদ্ধ করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শ্রীপাণ্ডে বলেন, এই বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে গ্রামবাংলা থেকে বহু ছেলেমেয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য রাজ্য এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে বিজ্ঞান প্রতিনিধিরা এই পদর্শনীতে যোগ দিয়েছেন। এটা অত্যন্ত সুখের কথা যে, প্রদর্শনীতে যোগদানকারী প্রতিনিধির সংখ্যা বেড়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের সমস্ত সমস্যাকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে এবং তা দূর করার জন্যে বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন মনোভাব রাখতে হবে। বিজ্ঞানকে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, জীবনের মান উন্নয়নের জন্যেও বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে।

এরপর রাজ্যপালের ইংরেজী ভাষণ বাংলায় অনুবাদ করে পড়ে শোনান কবি গোপাল ভৌমিক। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণ শেষ করে বলেন, আমি বাংলা বুঝতে পারি, কিন্তু বলতে পারি না।

জওহর শিশুভবনের ডিরেক্টর যুগল শ্রীমল বলেন, বিজ্ঞানকে শুধু গজদন্ত মিনারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তিনি বলেন, বিজ্ঞানের সাহায্যে দারিদ্র্য দূর করতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে বিজ্ঞানকে আদরণীয় করতে হবে। শিশুদের করে তুলতে হবে বিজ্ঞান-মুখী।

তিনি বলেন, এ ধরনের বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হলো, সারা দেশে সদা সচেতন, জাগ্রত, বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ তৈরী করা।

এই প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উড়িষ্যা ও তামিলনাড়ুর বিজ্ঞান সংস্থা ও স্কুল যোগ দিয়েছে। বাংলাদেশের একটি বিজ্ঞান ক্লাবও প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীর কদিনই সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রালের উঠোন কলকলিয়ে উঠেছে কচিকাঁচাদের স্বরে। প্রতিটি স্টল তারা ঘুরে দেখেছে। প্রশ্ন করেছে।

শ্রীরামপুর সায়েন্স ক্লাবের সদস্যরা পাঁচটা মডেল এনেছিলেন। শ্রবণ বাগচি তৈরী করেছে আইডিয়াল ম্যালেরিয়া ফ্রি-ভিলেজ, সিদ্ধার্থ ঘোষ বানিয়েছে উন্নত তাঁত, সান্ত্বনা বানার্জির সৌরশক্তির সাহায্যে পরিশ্রুত জল, লালমোহন মোদকের প্যাডেল চালিত নৌকো, অসীম চ্যাটার্জির প্রাণিদেহে কোষ বিভাজন, প্রায় সবাই দেখেছেন। যাঁরা এসব মডেল তৈরী করেছেন, তাঁরা সকলেই স্কুলের ছাত্র।

চাতরার নন্দলাল ইনস্টিটিউশন এনেছিলো দুটি মডেল।

সুব্রত কুমার দত্তের ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্র ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ এবং সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের উন্নত-মানের আখমাড়াই কল।

যাদবপুরের সপ্তর্ষি সায়েন্স ক্লাব এনেছিলো দুটো মডেল। অসীমাভ বড়ুয়া চৌধুরীর জোয়ার-ভাটা থেকে বিদ্যুৎ ও মনীশ গঙ্গুলীর অন্ধের যষ্ঠি। ব্যাটারি লাগানো এই লাঠি জলে বা কাদায় পড়লেই কোঁ কোঁ শব্দ তুলে লাঠি ধরা অন্ধ মানুষটিকে সাবধান করে দেবে। এই মডেল তৈরীকারী দুজনেই কলেজের ছাত্র।

বেহালার কসমিক সায়েন্স ক্লাব এনেছিলো দুটো মডেল। রথীন ঘোষের তৈরী বায়ুদূষণ কিভাবে রোধ করা যায় আর অনির্বাণ রায়ের রোমান্টিক লাইট।

ঠাকুর নগর, চব্বিশ-পরগনার প্রভাতী বিজ্ঞান বিচিত্রা চার্ট ও ছবিতে দেখাচ্ছিল প্রতিবন্ধীদের কিভাবে সাহায্য করা যায় ও শিক্ষা দেয়া যায়। গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট এনেছিল তিনটে মডেল ও কিছু চার্ট। মডেলের মধ্যে ছিল নারায়ণ চন্দ্র পালের সৌর চুল্লী, অঞ্জন কুমার হালদারের তাল ও খেজুর প্রকল্প, নির্মাল্য ভট্টাচার্যের প্রাকৃতিক চিকিৎসা।

জওহর শিশুভবন আয়োজিত অষ্টম বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে খুদে বিজ্ঞানীরা রাজ্যপালকে তাদের মডেল সম্পর্কে বোঝাচ্ছে।

রাজবল্লভ হাইস্কুল এনেছিল চারটে মডেল। পার্থ বসুর তৈরী লাঙল, মই ও গোলাবাড়ি। গোবর গ্যাস প্লান্টের মডেল তৈরী করেছে সুশান্ত মাসাকার। ফোর্ট উইলিয়ামের কেন্দ্রীয় স্কুল এনেছিল চারটে মডেল। রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল এনেছিল চারটে মডেল। দেবাশিস ঘোষের রেশম চাষ, শান্তনু গাঙ্গুলীর ভূমিক্ষয় ও তার প্রতিকার, শুচিব্রত কবিরাজের দুর্গাপুর কোক ওভেন প্লান্টের সঙ্গে ছিল গাছ-গাছড়ায় তৈরী নানা ওষুধের নমুনা। আশ্রম সায়েন্স ক্লাব দেখাচ্ছিল চায়ের থেকে ক্যাফিন তৈরী ও তার ব্যবহার।

ভুবনেশ্বরের ডি এ ভি স্কুল এনেছিল কেমিকেল গার্ডেন আর নাইট ল্যাম্পের মডেল। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল এনেছিল সাতটা মডেল। সুমন গাঙ্গুলীর বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা, ভাস্কর চ্যাটার্জির মাটি ছাড়া চাষ, চন্দন পাল আর গৌতম দাসের সুরক্ষিত সিন্দুক। কলকাতার খাল প্রকল্প মডেল তৈরী করেছিল পরীক্ষিৎ দে ও বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। দূষিত জলের উন্নততর পরিশোধন বানিয়েছিল দেবব্রত চ্যাটার্জি ও সঞ্জয় দত্ত। দীপনারায়ণ গুপ্ত ও প্রদীপ্ত দে তৈরী করেছিল চক্ররেল প্রকল্পের মডেল। প্রতীপ রায় ও অনিন্দ্য পাল তৈরী করেছিল সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ।

চিত্তরঞ্জনের আমরা কজন সায়েন্স ক্লাব এনেছিল দেবাশিস মণ্ডলের তৈরী ধাতু চেনার যন্ত্র, সুবীর ঘোষের চৌম্বক হিটার। ইয়ুথ সায়েন্স কর্নার এনেছিল তিনটে চার্ট। ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল এনেছিল ইলেকট্রনিক অর্গান, সিনথেসাইজার, মনোফিনক থেকে স্টিরওফনিক কনভার্টার।

হিন্দুস্কুল সায়েন্স সেন্টারের ছেলেরা মানুষের মস্তিষ্ক, হাঙ্গর আর সাপ দেখিয়ে বিস্তারিত বলছিল। ওই স্কুলের জয়দীপ শীলের হাঙ্গার ড্রাইভ এক্সপেরিমেন্ট মডেলটি সকলকে বেশ মজা দিয়েছে। একটা সাদা ইঁদুর খিদে পেলে কি ভাবে ইলেকট্রিক শক উপেক্ষা করে খাবারের দিকে দৌড়ে যায়, তা নিয়েই ব্যাপার। পুরুষ ইঁদুরের থেকে স্ত্রী ইঁদুরের খিদে সহ্য করার ক্ষমতা কম, এটা দেখানো হলো ওই মডেলের মাধ্যমে। জওহর শিশুভবনের ছেলেমেয়েরাও অংশ নিয়েছিল এ প্রদর্শনীতে।

বাংলাদেশ থেকে আসা বিজ্ঞান সংস্থার সদস্যরা দেখাচ্ছিলেন মানুষের আই কিউ পরীক্ষার কায়দা। ছিল ওয়েসিস সায়েন্স ক্লাব আর রোরকেল্লার একটি বিজ্ঞান ক্লাব সমেত আরও অনেক বিজ্ঞান ক্লাব ও স্কুল।

ঘুরতে ঘুরতে জানা গেল, ১ থেকে ৪ এপ্রিল কোলাঘাট সায়েন্স হবি সেন্টারের পরিচালনায় কোলাঘাট ইউনিয়ন হাইস্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী হবে।

বাহারি মডেল, গুঞ্জন, পোশাক-আশাক, প্রশ্ন উত্তর হৈ-চৈয়ের মধ্যে বেশ চলে গেল বিজ্ঞান প্রদর্শনীর কটা দিন।

পূর্ব-ভারত বিজ্ঞান শিবির '৮২

বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার বিড়লা মিউজিয়ামের প্রাঙ্গণে বসেছিল ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মেলা—১৯৮২ সালের 'পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির'। এই শিবিরের আগে পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলায় 'জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা' অয়োজিত হয়েছিল। প্রতিটি জেলার প্রথম সাতজন সফল কিশোর-কিশোরী আমন্ত্রিত হয়েছিল কলকাতার বিজ্ঞান শিবিরে। জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় সর্ব সমেত ২৫০টি স্কুল ও ১০০টি বিজ্ঞান ক্লাবের ১০২১ জন প্রতিযোগী ৭৫৬টি মডেল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবিরে এছাড়াও নাগাল্যাণ্ড, ওড়িশা, বাংলাদেশ, বিহার, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং মিজোরাম থেকেও মোট ১৭০ জন প্রতিযোগী ১০৭টি মডেল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

ছাত্রদের জন্য উদ্যোক্তারা পাঁচটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করেছিলেন—সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং, ফটোগ্রাফি, মিটিওরোলজি, লাইফ সায়েন্স ও সেরামিক্স। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য খোলা হয়েছিল দুটি বিশেষ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। এখানে ট্রানজিস্টার রেডিও তৈরী, দরজির কাজ, রোল্ কোর্ড পদ্ধতির ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

বিজ্ঞান শিবির চলাকালীন আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে ছাত্রদের সাময়িক একটি আবাস সম্পূর্ণ পুড়ে যায় তবু মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ, কর্মীদের উদ্যোগে ও অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের সহযোগিতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে ও শিবিরের কর্মসূচীর কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

এবারের বিজ্ঞান শিবিরে, বিশেষভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অধিকসংখ্যক বিজ্ঞান ক্লাবের অংশগ্রহণ। তাছাড়া মডেল তৈরির ব্যাপারেও ক্রমশই সামাজিক সচেতনতার প্রকাশ ঘটছে। ছাত্ররা যে তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যা, পরিবেশ গত সমস্যার সমাধান কল্পে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে চাইছেন সেটা তাঁদের তৈরী মডেল থেকেই স্পষ্ট।

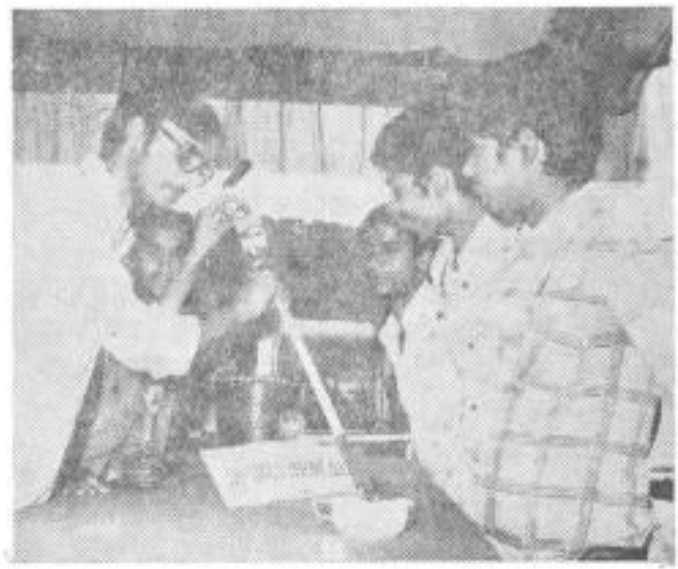

সপ্তর্ষি বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যগণ মডেল বোঝাচ্ছে।

এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকার করেছে দার্জিলিঙের সেন্ট জোসেফ কলেজের শ্রীদিবাকর থাপা। শ্রীমান থাপা শরীরের ওপর ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলি দেখিয়েছে তার মডেলে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মালদার মিল্ক হাইস্কুলের শ্রীমান মোতাহার আলি ও আবু তালেব একটি ঘরে বসে চালানোর মতো তিলিং যন্ত্র বানিয়েছে। আর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে কোচবিহারের মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের শ্রীমান গৌতম দত্ত একটি স্বয়ংক্রিয় সেলস্ কাউন্টার তৈরি করে। মেঘালয় এবছর পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবিরে সেরা রাজ্যের সম্মান লাভ করেছে।

* * * * * * * *

ষষ্ঠ নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির একটি আলোর প্রতীক

বিগত ১—৩রা ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় দি সায়েন্স আসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল আয়োজিত ষষ্ঠ নিখিল বঙ্গ বিজ্ঞান ও শিল্প শিবির—৮২ অনুষ্ঠিত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিবিরটি পরিচালনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব।

এই শিবিরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ও সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থার পর্যালোচনা এবং গ্রামীণ স্থানীয় সম্পদকে ব্যবহার করে সুষ্ঠু এবং বিজ্ঞানাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে শিবিরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় দুদিন ব্যাপী একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন রকম আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও

সমাজ উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচী ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন বক্তা এই সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা তাদের সুন্দর বক্তব্য রাখেন এবং তাদের গ্রামীণ সমস্যার ব্যাপারে উল্লেখ করেন। সেমিনারে প্রতিনিধিদের বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ সুবিধা এবং তাদের যাতায়াতের খরচ খরচা বহন করা হয়।

মাননীয় কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প মন্ত্রী শ্রীচিত্তব্রত মজুমদারের অনুপস্থিতির জন্য শিবিরটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। তিনি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাবকে অভিনন্দন জানান। আয়োজন সীমিত তবে এর তাৎপর্য সীমাহীন। এদেশে 70% লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। দুবেলা খেতে পায় না—সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার খুব সহজ নয়। আমরা বাস্তবত উন্নয়নশীল দেশ নয়—আমরা অনুন্নত। যদিও বলা হয় আমাদের দেশে বিজ্ঞানীর সংখ্যা বিশ্বে তৃতীয়—সব মনে রেখেই বলছি আমরা উন্নত নই—কারণ এখনও খেতে পাই না। ছোটবেলায় গান্ধীজির কথা (গ্রামে যাওয়া, স্বাবলম্বী গ্রাম তৈরী করা ইত্যাদি) ভাল মনে করতুম না। এখন ষাট বছর বয়সে মনে করছি তিনি ঠিক ভাবে গ্রামকে বুঝে-ছিলেন। এদেশে এখনও ৫০ বছর সময় লাগবে সমগ্র গ্রাম শহর এক হতে। ২৩ কোটি লোক নিরক্ষর এবং ৯০ ভাগ লোক দরিদ্র সীমারেখার নীচে বাস করে। এর একটা উপায় যতটা সম্ভব বিজ্ঞান সচেতন করে জীবনকে আরও একটু সুন্দর করা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন: বিজ্ঞান আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। তার একটি ধারা বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন—সবটুকু নয়। লক্ষ্য হিসেবে মোটামুটি একটা অবস্থানে পৌঁছেছি—তাহলে বিজ্ঞান চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে, এর অর্থ এইভাবে বোঝা যায় যে বিজ্ঞান যারা পড়েছেন তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ছড়ানো সম্ভব—এটা ঠিক নয়—এর ৩৫% তার মধ্যেও প্রায় ২০% প্রাথমিক পর্যায় থেকে মা সরস্বতীকে বিদায় জানায়। ফলে অন্ধ-বিশ্বাস, অর্থহীন চেতনা (মাদুলী, তাবিজ, সাপ্তাহিক রাশিফল, শনিঠাকুরের পূজো) ইত্যাদি দূর হয় না। থেকে যায়, বেড়ে যায়। তাহলে উপায়? কি ভাবে সকলকে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলা যায়—আসল কথা হোল একটু যুক্তি-

সায়েন্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে প্রতিযোগীরা মডেল বোঝাচ্ছেন।

বাদী মন এবং পরীক্ষা নির্ভর বিশ্বাস। গ্রামের নাম সংকীর্তন, মানসিক, ঠাকুর পূজো এখনও আছে। থাকবে, একে বন্ধ করা যায় না এবং যাবে না। এ নাম সংকীর্তনের সঙ্গে যদি টীকা নেওয়া ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দিতে পারি যে নামসংকীর্তনের থেকে টীকা নেওয়া বিশেষ জরুরী। বিজ্ঞান শিক্ষা সব কিছু করতে হয়—চোখ, নাক, কান, মুখ সব। সুতরাং নাক, চোখ, কান সব ঠিক ঠিক রাখতে হবে, সজাগ রাখতে হবে—এই কথাটাও শেখাতে হবে। তিনি মানুষের কথা ভেবে, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রেমী তরুণদের এই কাজ হাতে নেবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন এ কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে তিনি তাঁর দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দ দ্বিগুণ করেছেন, তাতে উৎসাহী প্রতিষ্ঠান অর্থের অভাবে পেছিয়ে পড়বেন না।

অনুষ্ঠানে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ডকটর বি. কে. বাচওয়াত তাঁর বক্তব্যে বলেন এতদিন ধরে যারা কাজ করছে—সেই বিজ্ঞানকর্মীদের আমরা লোকের চোখে বড় করতে পারিনি। তাদের কাজকে তুলে ধরতে পারিনি জনসমক্ষে। ফলে পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকরা দেশীয় বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছেন।

১এ মুখার্জী পাড়া লেন, কলকাতা-২৫

বিচিত্র উদ্ভিদ • অংশুমান চক্রবর্তী

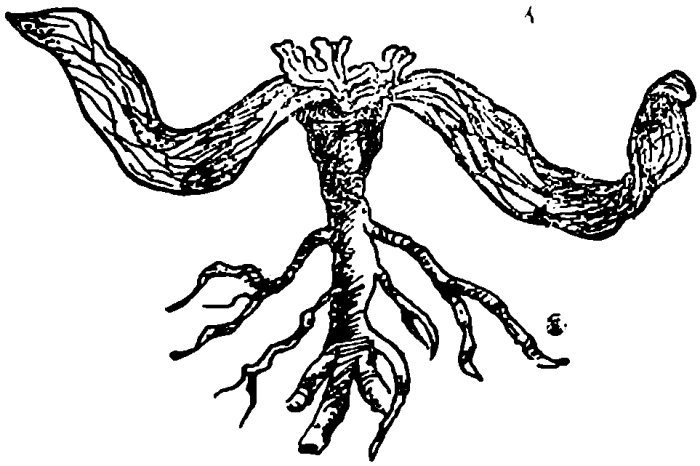

চিত্র (১) ওয়েল উইটশিয়া গাছ

[এক] যে গাছের পাতা একশ বছর বাঁচে

এক আশ্চর্য ধরনের গাছ। নাম ওয়েলউইশিরা। এই ওয়েলউইশিরা গাছের ওপরের দিকটা চ্যাপটা। গাছটির ওপরের দিকের শেষ প্রান্ত থেকে মাত্র দুটি পাতা বের হয়। এই গাছটি বাঁচে প্রায় একশ বছর গাছের পাতা দু'টিও বাঁচে একশ বছর।

চিত্র (২) ম্যানড্রেক গাছ

[দুই] যে গাছ দেখতে মানুষের মতো

প্রকৃতির এক অম্লান অবদান ম্যানড্রেক গাছ। গাছটি দেখতে মানুষের মতো। বর্তমানে পৃথিবীতে এই গাছ লোভ পেয়েছে। নুরেনবার্গ শহরের মিউজিয়ামে এই গাছের একটি ছবি আছে।

চিত্র (৩) দানু পাদপ গাছ

[তিন] মরুভূমির পথিকদের দুহৃদ পান্থপাদপ গাছ। এই গাছের পাতা কলা গাছের পাতার মতো সাধারণতঃ এই গাছ মরু অঞ্চলে জন্মায়। এই গাছের দীর্ঘ কাণ্ডে জল সঞ্চিত থাকে। মরুভূমির তৃষ্ণার্ত পথিকেরা এই গাছের কাণ্ড কাটিয়া জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করেন।

[চার] অস্ট্রেলিয়ার এক ধরণের গাছ জন্মায় নাম ব্যারেল ট্রি বা পিপা গাছ। এই গাছের গুড়িটি পিপার মতো দেখতে অর্থাৎ মধ্যস্থল মোটা ও উপরে নিচের দিক অপেক্ষাকৃত সরু। তাই এই গাছের ঐরূপ নামকরণ।

২৩/১, ভূপেন্দ্রনাথ রোড,উত্তর পাড়া, হুগলী।

ছোটদের দপ্তর

পরিচালক : জয়ন্ত দত্ত

● তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক এবং স্কুলে পড়াশোনা করছ—'ছোটদের দপ্তরে' লেখা পাঠাতে পার। সম্পাদকমণ্ডলীর মনোনয়ন পেলে সে লেখা 'ছোটদের দপ্তরে' ছাপা হবে। তবে শব্দ সংখ্যা কিছুতেই যেন ২০০-এর বেশী না হয়। সংগে প্রয়োজন মতো ফটো বা আঁকা ছবি পাঠাবে।

● শুধু আমাদের প্রশ্নই নয়, তোমরাও ছোটদের দপ্তরে প্রশ্ন পাঠাতে পার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পড়াশোনার প্রশ্ন, যার উত্তর আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করব।

"বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার' প্রশ্নের উত্তর চলিত মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো চাই।

প্রশ্নের সঙ্গে তোমরা নিজেদের বয়স কিন্তু উল্লেখ করবে।

তবে সব ক্ষেত্রেই চিঠি বা খামের উপরে 'ছোটদের দপ্তর' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার মার্চ সংখ্যার—দশ বা তার বেশী সঠিক উত্তরদাতার নাম।

১। সুকান্ত ঘোষ—নিউ ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা।
২। শান্তনু চক্রবর্তী—ঐ
৩। সুবীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—৬২১/১, লালবাজার ডিপোগোড়া, বাঁকুড়া-৭২২১০১।
৪। আব্দুল নাইম—আঙ্গারসন, বর্ধমান।
৫। সুমন সরকার—গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
৬। সন্দীপন মুখোপাধ্যায়—রাইমাটাং চা বাগান, কালচিনি, জলপাইগুড়ি।
৭। মনসিজ মুখোপাধ্যায়—ঐ
৮। শুভেন্দুশেখর ভুঁইয়া—শিকারপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিকারপুর, নদীয়া।
৯। কমলেশ সাহা—হুগলী।
১০। সঞ্চিতা সাহা—বরাকর, বর্ধমান।
১১। ইন্দ্রনীল ঘোষ—২৬/এ শরৎ ঘোষ স্ট্রীট, কলি-১৪।
১২। মোহন চট্টোপাধ্যায়—শ্যামনগর, ২৪ পরগনা।

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

প্র: রেডিও চলাকালীন তার সামনে কোন ক্যাল্কুলেটার চালু করলে শব্দ হয় কেন?

(রেডিওর শব্দ)

প্রদীপ মুখার্জী

৭/১৭ মহিসকাপুর রোড, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫ বর্ধমান।

উ: রেডিও বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রহণ করে শব্দে রূপান্তরিত করে। ঘরের আলো পাখা ইত্যাদির সুইচ জ্বালা ও বিশেষ করে নেবানোর সময় যে 'সম্পর্ক' বা তড়িৎ-মোক্ষণ ঘটে তার জন্যেও রেডিওর শব্দ হয়। শুনেছেন নিশ্চয়? এর কারণ তড়িৎ মোক্ষণের সময়েও বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হয় যা রেডিওয় ধরা পড়ে। একে বলা হয় 'ইলেক্ট্রিকাল নয়েজ'। একই কারণে ইলেক্ট্রনিক ক্যাল্কুলেটারের সুইচ টেপার জন্য যে স্পার্ক হয় (অতি সামান্য হলেও) তার থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ রেডিওয় ধরা পড়ে ও শব্দে রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্ন : (ক) কোন বৈজ্ঞানিক পারদ আবিষ্কার করেন?

(খ) পৃথিবীতে কোন কোন দেশে পারদ পাওয়া যায়?

(গ) পৃথিবীতে কোন কোন দেশে পারদের উৎপাদন বেশী?

শ্রীমোহন চ্যাটার্জী

শ্যামনগর, শান্তিগড়। ২৪ পরগনা।

উ: (ক) বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক বোধ হয় পারদ আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। সাধারণতঃ সিনাবার (Cinnabar) নামে একটি খনিজ থেকে পারদ উৎপাদিত হয়। স্পেনের Cindal Real প্রদেশের Almaden-এর খনি থেকে ৪০০ থেকে ১৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে প্রথম সিনাবার উত্তোলিত হয়। এখনো পর্যন্ত এই খনিটি বিশ্বের পারদের প্রয়োজন মেটাবার একটি বড় উৎস। প্রথম শতাব্দীতে ডাওস্কোরাইড্স্ (Dioscorides) নামে এক গ্রীক্ চিকিৎসক ওষুধ হিসাবে পারদের গুণ বর্ণনা করেছিলেন।

উঃ (খ) খনি থেকে সিনাবার পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাডা, আলাস্কা, ও ইডাহোয়। তাছাড়া স্পেন, ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়াতেও বড় বড় সিনাবার খনি আছে।

উ: (গ) স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

নিজে বানাও প্রোজেক্টর

সৌমেন চক্রবর্তী

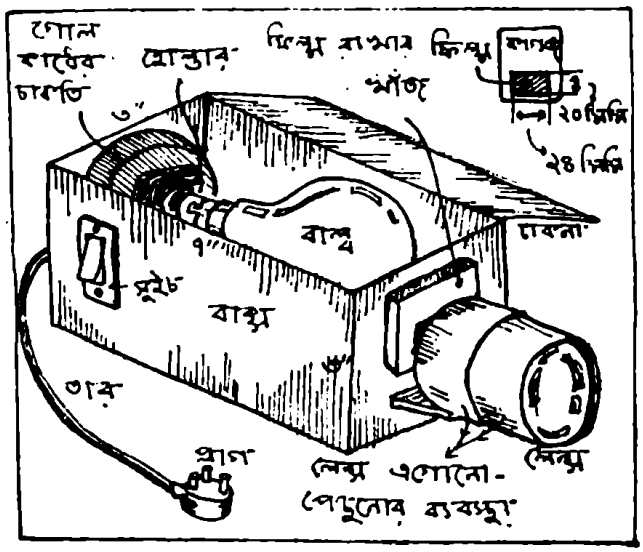

সেদিন বুবুন আর টুকুন 'হীরক রাজার দেশে' দেখে এল। এসেই বাবাকে প্রশ্ন--কি করে সিনেমা হয়, কি করে নড়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবা বললেন—'আস্তে আস্তে বুঝতে হবে। তার চেয়ে বরং তোমরাই একটা ছোটখাটো প্রোজেক্টর বানিয়ে ফেল। তাহলেই আরো ভালো বুঝবে, তাই না?'

ওদের এক সঙ্গে উত্তর—'তা তো বটেই।'

বাবা বললেন—'বুবুন, তাহলে একটা কাগজ নিয়ে লিখে ফেল। প্রথমে সাত ইঞ্চি লম্বা, তিন ইঞ্চি চওড়া, ও তিন ইঞ্চি গভীর একটা বাক্স যোগাড় করতে হবে। কাঠেরই ভালো, তবে পিচবোর্ডের বাক্সেও কাজ চলবে। পেছন দিকে একটা ছোট ফুটো করে সেখান দিয়ে তার নিয়ে পেছন দিকে একটা হোল্ডার বসাতে হবে। সাধারণ বাল্ব লাগাতে পারো, তবে 'সুপারলাক্স' বাল্বই বেশী ভালো হবে। কিন্তু আরো দুটো জিনিস চাই। একটা হচ্ছে দেখাবার জন্য ফিল্ম। অবশ্য এই প্রোজেক্টরে শুধু স্থির ছবিই দেখা যাবে। আর চাই দুটো লেন্স, যা আমাদের বাড়ীতেই রয়েছে।

পরদিনই বাবা ফিল্ম কিনে আনলেন। আর আনলেন বাল্ব। প্রথমেই বুবুন আর টুকুন বাক্সের সামনে ২৪ মি. মি. বাই ২০ মি. মি. মাপের একটা চৌকো খোপ কেটে নিল। তারপর সেখানে ফিল্ম বসিয়ে বাল্ব জ্বালিয়ে দিলেন বাবা। লেন্স দুটো একটু আগু পিছু করতেই দেওয়ালে পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠল। ওরা হাততালি দিয়ে উঠল।

বেলগাছিয়া ভিলা, কলকাতা-৩৭

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

শ্রীবৈজ্ঞানিক

১। শব্দের বেগ আর্দ্র গ্যাসে বাড়ে না কমে?

২। ধমনীর রক্তের রঙ কেমন?

৩। বরফের উপর চাপ বাড়ালে তার গলনাঙ্কের কি রকম পরিবর্তন হয়?

৪। উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক হর্মোনের নাম কি?

৫। কোন্ যন্ত্র যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে?

৬। কোন্ রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির জন্যে সিঁদুরের রং লাল হয়?

৭। বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রের আবিষ্কর্তা কে?

৮। দুধের প্রোটিনের নাম কি?

৯। গাছে ফুল ফোটাতে সাহায্যে করে কোন্ হর্মোন?

১০। লাল রঙের ফুল সবুজ আলোতে কেমন দেখায়?

১১। মানুষের হাত কোন্ শ্রেণীর লিভার?

১২। A. C. (পরবর্তী প্রবাহ) থেকে D. C. (সমপ্রবাহ) পাওয়ার জন্যে কোন্ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়?

১৩। বংশগতির বাহক কাকে বলা হয়?

১৪। হীরকের উপাদান কি?

১৫। Pd চিহ্নটি কোন্ মৌলকে বোঝায়?

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

×	×	×	১হৃ	×	×	×	×	×	×
২য	কৃ	ৎ	×	×	×	×	×	×	×
×	×	৩পি	ও	স্থ	৫লী	×	×	×	×
৪পা	ক	ম্ল	ণ্ড	×	৬এ	ন	জ্ঞা	ই	৭ম্ল
ক	×	×	×	×	×	তা	×	×	শ্ব
স্থ	×	×	×	×	×	৭প	রি	৮পা	ক
লী	×	×	×	×	×	×	×	তা	×

রহস্যময় সিন্দুক

শান্তনু নায়েক

'এই দ্যাখ্ সুনীল, এই সিন্দুকটার কথাই বলছিলাম তোদের। একমাত্র আমার দাদু ছাড়া কেউ এটাকে খুলতে পারে নি। দাদু মারা যাবার পর থেকে গত এক বছর ধরে বন্ধই আছে এটা।' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল রঞ্জন।

'এটায় কি আছে রে, রঞ্জন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমাদের টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি থেকে আরম্ভ করে দলিল-দস্তাবেজ সমস্তই আছে এর মধ্যে। আমরা ঠিক করেছি দাদুর মৃত্যুবার্ষিকীটা পেরিয়ে গেলেই ভেঙে ফেলব এটাকে। কিন্তু ভাঙাটাও সহজ হবে না।'

'গয়নাপত্র লকারে রাখিস না তোরা? চোর-ডাকাতের যা উপদ্রব আজকাল!' সিন্দুকটার দিকে এগিয়ে যায় সুনীল।

'দাদু বলতেন চোর-ডাকাতের চোদ্দপুরুষেরও সাধ্য হবে না এটাকে খোলে বা ভেঙে ফেলে। লকারের থেকে দাদু এটাকে নিরাপদ মনে করতেন। তোরা একটু চেষ্টা করে দ্যাখ্ না সুনীল!' বাঁকা হাসির ঢেউ খেলে যায় রঞ্জনের মুখে।

আমি আর সুনীল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগলাম সিন্দুকটা। হাতলের মত একটা জিনিস চোখে পড়ল। সেটা ধরে নানাভাবে টানাটানি করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু ফল হল না কিছুই।

সুনীল ততক্ষণে সিন্দুক ছেড়ে ঘরটার চারিদিকে দৃষ্টি বোলাতে শুরু করেছে।

ঘরটা খুব একটা বড় নয়। খাটটার উপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে ছাদ স্পর্শ করা যাবে। খাটটার মাথার দিকের দেওয়ালের সাথে গাঁথা রয়েছে সিন্দুকটা। সিন্দুকের পাশেই একটা আলমারী। স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে আলমারীর মধ্যের বইগুলো দেখা যাচ্ছে—সমস্তই পদার্থবিদ্যার বই। আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই দেখছি, তখন সুনীল হাতে তুলে নিয়েছে আলমারীর মাথার উপর রাখা ছোট্ট একটা ভেস্‌লিনের কৌটো।

'ভেস্‌লিন কি কাজে লাগে তোদের?' সুনীল জিজ্ঞাসা করে।

'সিন্দুকের ডালাটার চারপাশে লাগাতে হয়। দাদুও লাগাতেন। না লাগালে নাকি খারাপ হয়ে যাবে সিন্দুকটা।'

'আচ্ছা, ঐ টেবিলক্লকটা কি বরাবর সিন্দুকটার উপর রাখা হয়?' সুনীল হাতে তুলে নেয় ঘড়িটা।

'বরাবর দাদু শুয়ে শুয়ে দম দিতেন আর ঘাড় ফিরিয়ে সময় দেখতেন। তুই কি মনে করিস ঘড়িটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমস্ত কৌশল।' হাসির মাধ্যমে অবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলতে রঞ্জন ওস্তাদ।

ঘড়িটা যেখানটায় রাখা ছিল সিন্দুকের সেই জায়গাটায় একটা ছোট্ট জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সেটা হলো একটা আলপিনের মাথা। দেখে মনে হচ্ছে সিন্দুকটায় সেটা গাঁথা রয়েছে। নখ দিয়ে তুলতে গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই।

ঘড়িটা যথাস্থানে রেখে আলমারীর সামনে দাঁড়ায় সুনীল। 'এই বইগুলো নিশ্চয় তোর দাদু পড়তেন?'

'হ্যাঁ, দাদু বিবেকানন্দ কলেজের ফিজিক্সের লেকচারার ছিলেন।'

'দ্যাখ্ অলোক, ঐ ধারের বইগুলো কতটা চওড়া, না? ওগুলো আমার পরিচিত। কিন্তু এতটা চওড়া তো নয়!'

'আমার মনে হয় বইগুলোর পেছনে কিছু একটা রাখা আছে। যার ফলে কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। সেইজন্যেই এত চওড়া দ্যাখাচ্ছে।' আমি বললাম।

'আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা রঞ্জন, আলমারীটা একবার খুলতে পারিস?'

'খোলবার দরকার নেই। বইগুলোর পেছনে আছে একটা যন্ত্র—যেটার নাম বায়ুনিষ্কাশক পাম্প। যন্ত্রপাতি দাদুর আরো অনেক ছিল। এবং এখনও আছে খাটের তলায় একটা ট্রাঙ্কে। তার মধ্যে এই পাম্পটাই ছিল দাদুর সব থেকে প্রিয়। তাই এটা নিয়ে প্রায়ই নাড়া-চাড়া করতেন।'

'আশ্চর্য! সমস্ত সম্পত্তি রেখে গেলেন সিন্দুকটায়। অথচ মারা যাবার আগে বলে গেলেন না, কিভাবে খোলা যাবে এটা।'

'বলার কি আর সময় পেলেন? সেদিন দাদুর ঘরের মেঝেয় বসে তাস খেলছিলাম। বাড়ীর মেয়েরা গল্প করছিল ঘরের সামনের বারান্দায়। দাদুই ডেকেছিলেন সকলকে। কি যেন একটা জরুরী কথা বলবেন। আমরা সকলে অপেক্ষা করছিলাম বাবার জন্য। দাদু চুপচাপ

শুয়েছিলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল। বাবা আসছেন না। তাস নিয়ে বসে গেলাম কয়েকজন। দাদু একটা বই পড়তে লাগলেন। রাত ন'টা বাজলো, দাদু হঠাৎ বিছানার উপর উঠে বসে উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন —'ভগবান-টগবান সব মিথ্যে। এ পৃথিবীর সর্বশক্তিমান হল বাতাস। সর্বত্র বিরাজমান অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল, এর শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে মানুষের অভাব অভিযোগ বলে কিছু থাকবে না।' এ পর্যন্ত বলেই ধপাস করে পড়ে গেলেন বিছানায়। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে দেখলাম, সব শেষ। তৃতীয় স্ট্রোক অ্যাটাক করেছে সময় বুঝে।' উদাসীনভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রঞ্জন।

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে সুনীল বলল. 'দ্যাখ্ রঞ্জন, এ সিন্দুকটা অক্ষতভাবে খোলা গেলে খুবই ভালো হয়। এবং আমি সে চেষ্টাই করছি। আমার বিশ্বাস আমার চেষ্টা নিশ্চয় সাকসেসফুল হবে। তুই ছোট্টমত সাঁড়াশী, কিংবা চিমটে অথবা প্লার্স-ট্যাস থাকে যদি তাই নিয়ে আয় না একটা। প্লার্স থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়।'

মিনিটখানেক পরে একটা সাঁড়াশী নিয়ে রঞ্জন যখন ফিরল তখন বাড়ীর অন্য লোকেরা ভিড় জমিয়েছে বারান্দায়। সুনীল প্রথমেই ঘড়িটা বিছানায় নামিয়ে রেখে সাঁড়াশী দিয়ে আলপিনটাকে তুলে ফেলতে চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সফল হল না।

রঞ্জন হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে কি আশ্চর্য। এতক্ষণ মনেই পড়ে নি। একটা ছোট্ট মত প্লার্স আছে বটে। দাদু ওটা আমাদের দেশের এক কামারকে দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন বলতেন ওটাই নাকি সিন্দুকের চাবিকাঠি।'

খাটের তলার ট্রাঙ্কটা থেকে ছোট্ট প্লার্সটা বের করল রঞ্জন। সরু মুখটায় খাঁজ-কাটা। সেটা দিয়ে আলপিনের মাথাটা ধরা গেল খুবই ভালোভাবে, তারপর একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই পিনটা খুলে বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা সোঁ সোঁ শব্দ। অত্যন্ত অবাক হয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে আমরা সকলে দেখলাম, সিন্দুকের ডালাটা আপনা থেকেই খুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

হৈ-হট্টগোল থামার পরে রঞ্জন সুনীলকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কি করে জানলি যে পিনটা খুলে ফেললেই সিন্দুকটা খুলে যাবে?'

সুনীল বলল, 'কতকগুলো সূত্র পরপর ভাবতেই জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সেগুলো হলো—এক নম্বর, তোর দাদু পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, দুই নম্বর— সিন্দুকের ডালার চারপাশে ভেসলিন নিয়মিত না মাখালে খারাপ হয়ে যাবে সেটা. তিন নম্বর—সিন্দুকের মাথার উপরের আলপিনটা ঘড়ির সাহায্যে ঢেকে রাখা, চার নম্বর—দাদুর প্রিয় যন্ত্র Exhaust Pump বা বায়ু নিষ্কাশক যন্ত্র, পাঁচ নম্বর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তোর দাদুর অন্তিম কথাগুলো। 'এ পৃথিবীর সর্বশক্তিমান হল বাতাস। সর্বত্র বিরাজমান অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল। এর শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে মানুষের অভাব-অভিযোগ বলে কিছু থাকবে না।' এ কথাকটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল 'ম্যাগডেবার্গের অর্ধগোলক' পরীক্ষাটার কথা। জার্মানীর ম্যাগডেবার্গ শহরের অটো ভন গেরিক নামে এক ভদ্রলোক ২ ফুট ব্যাসের দুটো ফাঁপা পেতলের অর্ধগোলক মুখে মুখে জোড়া লাগিয়ে একটা পূর্ণ গোলক তৈরী করেন। একটা অর্ধগোলকের সাথে চাবিযুক্ত যে নল লাগানো, সেই নলটার সাথে বায়ুনিষ্কাশক পাম্প্ ফিট করা যায়। অন্যটায় একটা হাতল লাগানো। অর্ধগোলক দুটো জোড়া লাগিয়ে যখন একটা গোটা গোলক তৈরী করা হয়, তখন সেটার মধ্যে বাতাস থাকার জন্য অর্ধগোলক দুটো বিচ্ছিন্ন করা খুবই সহজ হয়। কারণ তখন গোটা-গোলকটার ভেতরের ও বাইরের বায়ুর চাপ সমান। কিন্তু অর্ধগোলকদুটোকে বায়ুনিরুদ্ধভাবে জোড়া লাগিয়ে যদি বায়ুনিষ্কাশক পাম্পের সাহায্যে ভেতরের সমস্ত বাতাস বের করে নেওয়া যায়, তাহলে সে দুটিকে আলাদা করা খুবই শক্ত ব্যাপার। কারণ তখন গোলকটার ভেতরে বায়ুর কোন চাপই থাকে না। যদি থাকে তাহলে খুবই সামান্যই থাকে। কিন্তু গোলকটার বাইরের বাতাস চারদিক থেকে এত প্রচণ্ড চাপ দেয় যে ছ'ছটা ঘোড়া লাগিয়েও অর্ধগোলকদুটো আলাদা করা সম্ভব হয় নি। বায়ুমণ্ডলের এই চাপের পরিমাণ শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। প্রতি বর্গইঞ্চিতে এই চাপের পরিমাণ প্রায় 14·7 পাউণ্ড বা প্রায় 7 সের। এখন ২ ফুট ব্যাসের অর্ধগোলক দুটোকে জোড়া লাগালে যে গোলক তৈরী হবে তার বাইরের তলের ক্ষেত্রফল হবে $4\cdot\frac{22}{7}\cdot 1^2$ বর্গফুট বা $\frac{88}{7}$ বর্গফুট। তার মানে—গোলকটার চারদিকে বায়ুমণ্ডল যে চাপ প্রয়োগ করবে, তার পরিমাণ হবে $\frac{88}{7}\times 144\times 14\cdot7$ পাউণ্ড বা $\frac{88}{7}\times 144\times 14\cdot7\times 453\cdot6\times\frac{1}{1000}$ কিলোগ্রাম। দাঁড়া দাঁড়া ক্যালকুলেশানটা করে দেখি'।

পেন বের করে বিশাল গুণটা করতে লাগল সুনীল।

12070·84032 কিলোগ্রাম। বাপ্‌রে বাপ্‌! গুণ তো নয়! যেন বেগুণ একখানা। মাথার মধ্যে আগুন ছুটিয়ে দিল পুরো। তা যাই হোক, রঞ্জনের দাদুর সিন্দুকটার বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার। বায়ুনিষ্কাশক পাম্প অতি উন্নত ধরনের শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে সিন্দুকের ভিতরের প্রায় সমস্ত বাতাস বের করে নিয়ে আলপিনের সাহায্যে বায়ুনিরুদ্ধভাবে আটকে রাখা হয়। এমন অদ্ভুত কৌশলে সিন্দুকটা তৈরী যে ডালাটা বন্ধ করলেই একেবারে বায়ুনিরুদ্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য আগে ডালাটা বন্ধ করে ভেতরের বাতাস বের করে নিয়ে পিন আটকে বায়ুনিরুদ্ধ করা হয়। কোথাও কোন ফাঁক থাকে না যদিও তা সত্ত্বেও ভেসলিন মাখিয়ে আরো এয়ারটাইট করে দেওয়া হয়। বাইরের বাতাসের প্রচণ্ড চাপের জন্য ডালাটা আর খোলা যায় না টেনে। তারপর খোলবার সময় বিশেষ ধরনের প্লাসের সাহায্যে পিনটা প্রথমেই খুলে দেওয়া হয়। ফলে সরু ছিদ্র দিয়ে ভেতরে বাতাস ঢুকে দুদিকের চাপ—মানে সিন্দুকের ভেতরের ও বাইরের বায়ুর চাপ সমান হয়ে যাওয়ায় ডালাটাও খুলে যায়।

হঠাৎ তীব্র বাতাসের ধাক্কায় শব্দ করে খুলে গেল রাস্তার দিকের জানালাটা। প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে দিয়েই লক্ষ্য করলাম অদূরের বিশাল আমগাছটা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায়।

৪নং, ভবানী ঠাকুর লেন, উত্তরফটক, বর্ধমান।

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সমাধান)

১। অর্লন (Orlon) এক প্রকার কৃত্রিম তন্তু। ২। 'রাডার' এর আবিষ্কর্তার নাম Robert Watson Watt. ৩। মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন 'উইলিয়ম হারভে'। ৪। T. N. T. কথার অর্থ 'ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন। ৫। সমুদ্রে দূরত্ব মাপার এককের নাম Knot (নট)। ৬। স্টীম টারবাইন-এর আবিষ্কর্তা 'চার্লস পারসন্‌স। ৭। 'মেসন' কণার আবিষ্কর্তা 'ডক্টর হিদেকি ইউকাওয়া'। ৮। যক্ষ্মা রোগের টিকার নাম বি. সি. জি (B.C. G), অর্থাৎ 'ব্যাসিলাস অফ ক্যালমেট অ্যাণ্ড গুয়েরিং'। ৯। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে 'মহুয়া' Bassia শ্রেণীভুক্ত। ১০। প্ল্যাটিপাস। ১১। অক্টিমিটার। ১২। গ্যালেনার সংকেত PbS. ১৩। রেভারেণ্ড গ্রেগর নামে এক ইংরেজ পাদ্রী। 1789 খ্রীষ্টাব্দে 'টাইটেনিয়াম' মৌলটি আবিষ্কার করেন। ১৪। অ্যালুমিনিয়াম মৌলটির পারমাণবিক গুরুত্ব 27.

সংখ্যাকূট

সঞ্জয় রায়

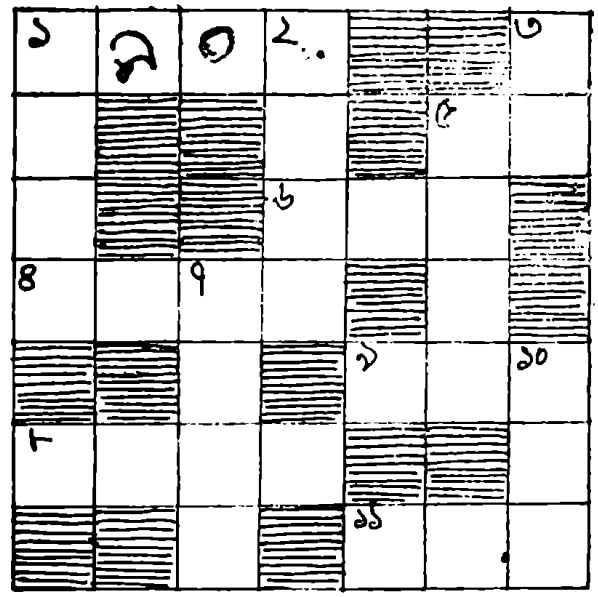

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ—

১। রেডিও যত খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।
৪। রবীন্দ্রনাথ যত খ্রীষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।
৫। H^2O-এর আণবিক গুরুত্ব।
৬। Rn-নামক মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব।
৮। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু সাল।
৯। LW-নামক মৌলের পরমাণুক্রমাঙ্ক।
১১। সীসার গলনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

উপর নীচ ঃ—

১। ক্লোরোফর্ম (CHLOROFORM) যত খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।
২। ইনসুলিন (INSULIN) যত খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।
৩। আমাদের চোখের পাতা গড়ে মিনিটে যতবার ওঠানামা করে।
৫। যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ইট পুড়ে লাল হয়।
৭। লোহের গলনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।
১০। পারদের স্ফুটনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়)

ভেবে কর ঃ সুবীর কুমার দাস

সময়=২০ মিনিট

প্রশ্ন—

(1) 12cm. উচ্চতার ঘনক থেকে কতগুলি 4cm. উচ্চতার ঘনক কেটে নেওয়া যায় ?

(2) দুইটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 1ঃ4 ; তাদের ব্যাসার্দ্ধের অনুপাত কত ?

(3) একটি বিড়াল এক মিনিটে একটি ইঁদুর খায়, 100টি বিড়াল কত মিনিটে 100টি ইঁদুর খাবে ?

(4) পঞ্চভুজের কতগুলি কর্ণ আছে ?

(5) একটি বৃত্তের পরিধি ncm, বৃত্তটির ক্ষেত্রফল কত ?

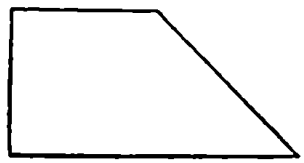

চিত্র—ক

(6) চিত্র ক-এর ক্ষেত্রটিকে চারটি সমান অংশে বিভক্ত কর।

(7) একটি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের মধ্যে পার্থক্য হলো 210 মিটার, বৃত্তটির ব্যাসার্দ্ধ কত ?

(8) ষড়ভুজের কর্ণ সংখ্যা কত ?

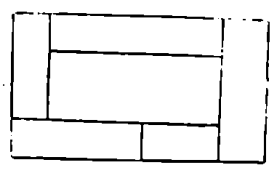

চিত্র—খ

(9) চিত্র খ-এ মোট কতগুলি আয়তক্ষেত্র আছে ?

(10) একটি বৃত্তের পরিধি 100 cm, ঐ বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য কত ?

(11) একটি বর্গের অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কি ?

(12) (4cm. × 2cm.) একটি মাপের আয়তক্ষেত্রাকার কাগজ থেকে যথাসম্ভব সবচেয়ে বড় বৃত্ত কেটে নিলে অবশিষ্ট স্থানের ক্ষেত্রফল কত হবে ?

উত্তর ও ব্যাখ্যা—

(1) ঘনকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান।

∴ 12cm. উচ্চতার ঘনকের আয়তন $=(12)^3$ ঘন সে.মি.।

আবার, 4cm. উচ্চতার ঘনকের আয়তন $=(4)^3$ ঘন সে.মি.।

∴ 12cm. উচ্চতার ঘনক থেকে যতগুলি 4cm. উচ্চতার ঘনক কেটে নেওয়া যায় তার সংখ্যা $=\frac{(12)^3}{(4)^3}=27$

(2) মনে করি, বৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্দ্ধ যথাক্রমে r_1 ও r_2

∴ বৃত্তদ্বয়ের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে πr_1^2, এবং πr_2^2

শর্তানুসারে, $\frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2}=\frac{1}{4}$

বা $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2$

∴ $\frac{r_1}{r_2}=\frac{1}{2}$

∴ বৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্দ্ধের অনুপাত 1ঃ2

(3) 100টি বিড়াল এক মিনিটেই 100টি ইঁদুর খাবে।

(4) পঞ্চভুজের কর্ণ সংখ্যা 5

(5) ধরা যাক, বৃত্তটির ব্যাসার্দ্ধ r cm.

∴ বৃত্তের পরিধি $=2\pi r$ cm.

∴ শর্তানুসারে, $2\pi r=n$

বা $r=\frac{n}{2\pi}$

∴ বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ $\frac{n}{2\pi}$cm.

∴ বৃত্তটির ক্ষেত্রফল $=\pi r^2$

$=\pi\times\frac{n^2}{4\pi^2}$ sq.cm,

$=\frac{n^2}{4\pi}$ sq. cm.

(6) চিত্র—ক

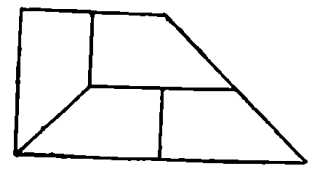

চিত্র—ক (চার সমান অংশে বিভক্ত)

(7) ধরা যাক্, বৃত্তটির ব্যাসার্দ্ধ r মিটার

∴ বৃত্তটির পরিধি $2\pi r$ মিটার এবং বৃত্তটির ব্যাস $2r$ মিটার শর্তানুসারে, $2\pi r - 2r = 210$

বা $2r(\pi - 1) = 210$

বা $r(3\cdot14 - 1) = 105$ [$\pi = 3\cdot14$]

বা $r = \frac{105}{2\cdot14} = \frac{10500}{214} = 49$ মিটার (প্রায়)

∴ বৃত্তটির ব্যাসার্দ্ধ 49 মিটার (প্রায়)

(8) ষড়ভুজের কর্ণসংখ্যা নয় (9)

(9) চিত্র খ-এ মোট 11টি আয়তক্ষেত্র আছে।

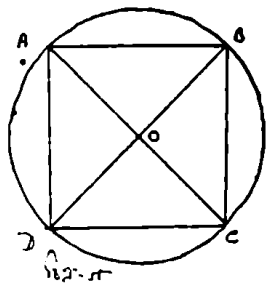

চিত্র—গ

(10) ধরা যাক, বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ r cm. (চিত্র—গ)

∴ বৃত্তটির পরিধি 2π cm.

∴ শর্তানুসারে, $2\pi r = 100$

বা $r = \frac{50}{\pi}$

বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের দৈর্ঘ্য = বৃত্তস্থ বর্গক্ষেত্রের কর্ণের অর্ধেকের দৈর্ঘ্য। বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমকোণে থাকে।

∴ বর্গক্ষেত্রের, (বাহু)$^2 = r^2 + r^2$

$$= \left(\frac{50}{\pi}\right)^2 + \left(\frac{50}{\pi}\right)^2$$

$$= \left(\frac{2500}{\pi^2}\right) + \left(\frac{2500}{\pi^2}\right)$$

$$= \frac{5000}{\pi^2}$$

$$\therefore \text{ বাহু } = \sqrt{\frac{5000}{\pi^2}} = \frac{50\sqrt{2}}{\pi} \text{ cm}$$

(11) ধরা যাক, বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য 2a. (চিত্র—ঘ)

বর্গক্ষেত্রের অন্তঃস্থ বৃত্ত বর্গক্ষেত্রের বাহুগুলিকে যে যে বিন্দুতে স্পর্শ করে সেই বিন্দুই বাহুর মধ্যবিন্দু।

$PQ = 2a$

$$\therefore \quad PM = \frac{2a}{2} = a$$

OM = অন্তঃস্থ বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ

PQ বাহুর M বিন্দুতে OM লম্ব।

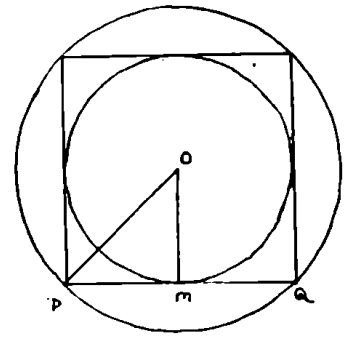

চিত্র—ঘ

বর্গক্ষেত্রের অন্তঃস্থ বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ বর্গক্ষেত্রের বাহুর অর্ধেকের সমান।

∴ $PM = a = OM$

∴ OPM একটি সমকোণী ত্রিভুজ,

∴ $OP^2 = PM^2 + OM^2$

$= a^2 + a^2 = 2a^2$

∴ $OP = a\sqrt{2}$

∴ বর্গক্ষেত্রের বহিঃস্থ বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ $= a\sqrt{2}$

আবার, বর্গক্ষেত্রের অন্তঃস্থ বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ $= a$

∴ বহিঃস্থ বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2 = \pi(a\sqrt{2})^2$

$= 2a^2\pi$

এবং, অন্তঃস্থ বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2 = \pi a^2$

∴ অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত $= a^2\pi : 2a^2\pi = 1 : 2$

(12) আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 4cm. ও প্রস্থ 2cm.

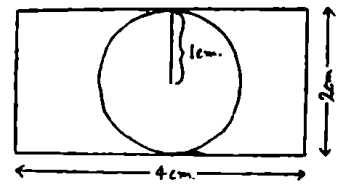

চিত্র—ঙ

∴ আয়তক্ষেত্র থেকে কাটা সবচেয়ে বড় বৃত্তের ব্যাস হবে 2cm.

∴ ঐ বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ 1cm.

∴ ঐ বৃত্তটির ক্ষেত্রফল $\pi r^2 = \pi \cdot 1^2$ sq. cm.

$= \pi$ sq. cm.

আবার, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

$= 4 \times 2$ sq. cm.

$= 8$ sq. cm.

∴ অবশিষ্ট স্থানের ক্ষেত্রফল $= (8 - \pi)$ sq. cm.

১০৭ উল্টাডাঙা মেইন রোড, ব্লক ৪, ফ্ল্যাট ৩৪
সি. আই. টি বিল্ডিং, কলিকাতা—৬৭

হারুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২.৫০ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২৫ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। **under certificate of posting**-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- **M. O.** বা **Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN**-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

R/ No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN • April 1982 Regd No WBCC/50

উপহার ও পাঠাগারের বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্‌স

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

- তেপান্তর ১৫-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- ছোটদের কাশীনাথ ৬-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

- কিশোর অপু ১৫-০০
- অপুর ছেলেবেলা ৬-০০
- ছোটদের অপরাজিত ৬-০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

- ছোটদের কাজল ৬-০০

বুদ্ধদেব বসু

- অপরূপ রূপকথা ১০-০০

পশুপাখী-বনজঙ্গলের গল্প

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

- বনেজঙ্গলে ১৫-০০
- পশুপক্ষী ১৫-০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

- পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ১০-০০

কেনেথ অ্যাণ্ডারসন

- বাঘের গর্জন ১৫-০০

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

- খুকুমনির ছড়া ১০-০০
- রাঙা ছবি ৩-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

- হট্টমালার দেশে ৫-০০

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

- ঘনাদার জুড়ি নেই ৫-০০
- মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫-০০
- ঘনাদা বিচিত্রা ১২-০০

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

- টেনিদার অভিযান ১৫-০০
- চারমূর্তি ৫-০০
- ঝাউবাংলোর রহস্য ৫-০০
- কম্বল নিরুদ্দেশ ৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত

- বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১০-০০
- মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৮-০০
- আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪-০০
- বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ৪-০০
- পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা ৪-০০

সমরজিৎ কর

- নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত

- আলো আরও আলো ১৫-০০
- রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২-০০

অমরনাথ রায়

- সংখ্যা নিয়ে খেলা ৫-০০
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫-০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

- মেঘনাদ ৮-০০ লুপ্তধন ৮-০০

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

- বাঙলার ডাকাত চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৬-০০
- মহিম ডাকাত ১০-০০

ফ্যান্টাসী, রহস্য ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

- সুন্দরবনে সাত বৎসর ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

- হাতিচোর ৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

- ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০-০০
- রামধনু ৬-০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু

- কায়াহীনের কবলে ৪-০০
- হট যাও হার্মাদ ৫-০০

শৈলেন্দ্রনাথ ধর

- দুরন্ত যাত্রী ৫-০০

কোনান ডয়েল

- শার্লক হোমসের কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭-০০
- শার্লক হোমসের কিশোর রহস্য গল্প ৭-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচ্ছদমুদ্রন : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২